হাসিকান্নার দিন

শ্রীমতী বাণী রায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

আশ্বিন, ১৩৫৯

লেখিকার অন্যান্য
বই

জুপিটার
পুনরাবৃত্তি
প্রেম
শূন্যের-অঙ্ক
রঞ্জনরশ্মি
সপ্তসাগর ইত্যাদি

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

'হাসিকান্নার দিনের' বন্ধুদের
দিলাম

ভূমিকা

গতানুগতিক ভূমিকা লিখবার উদ্দেশে কথার অবতারণা নয়। এই ছোট্ট, কিশোরীপাঠ্য উপন্যাসখানি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে।

বাংলায় ছোট মেয়েদের উপযুক্ত উপন্যাস দুর্ভাগ্যক্রমে লেখা হয়নি। আমাদের শৈশবে অভাব অনুভব করে হাত বাড়িয়েছিলাম আমেরিকায়। শ্রীমতী অল্‌কাটের লেখা 'Little Women' ও 'Good Wives' পড়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, বাংলা কোন বই সে আনন্দ দিতে পারেনি। ইংরেজি ভাষায় স্বনামে ও বেনামে লিখিত কিশোরী ও বালিকাদের উপযুক্ত অজস্র সাহিত্য। কেন আমাদের দেশে নেই?

আমি শিশুসাহিত্যিক নই। এদিকে মনোযোগ তাই দেবার দরকার হয়নি। একদা আমার কাকা লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক শ্রীনির্মল চৌধুরী (বুদ্ধুভুতুম) তাঁর সম্পাদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকার জন্য একখানা বই লিখে দেবার অনুরোধ জানান। স্বভাবসিদ্ধ আলস্যে এড়িয়ে গেলাম অনুরোধ। কিন্তু, তিনি ক্রমাগত আমাকে তাগিদ দিতে লাগলেন এই বলে যে, সত্যই বাংলাভাষায় ছোট মেয়েদের পছন্দমত তাদের নিজস্ব কোন বই নেই—লেখা উচিত। বুদ্ধুভুতুমের অনুরোধই 'হাসিকান্নার দিনের' অনুপ্রেরণা। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম।

আমি ভেবে দেখলাম: দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়েছে, সংখ্যায় মেয়েদের স্কুল অনেকগুলি। সমানভাবে আজ মেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে। তাদের স্কুলজীবন নিয়ে লিখবার মালমশলা অনেক আছে। যে মেয়ে

রূপকথা শেষ করেছে, অথচ বড়দের বই পড়বার বয়স পায়নি, সে-সব মেয়ের জন্য তো কই বিশেষ করে তো কোন বই লেখা হচ্ছেনা! সে বই শুধু তাদেরি নিজস্ব সাহিত্য।

বাংলার শিশুসাহিত্য রূপকথার যুগ পার হয়ে এসেছে, পার হয়ে এসেছে সোজাসুজি অনুবাদের যুগ। এখন বিদেশী ভাষার বিকৃত অনুকৃতিতে সস্তা অভিযান, আজগুবি ভূতের কাহিনী, গোয়েন্দা-রহস্য কণ্টকিত শিশুসাহিত্য। শুধু ছেলেদের মনের একটা দিকের তৃপ্তির আশায় লেখা হচ্ছে কোন কোন ছোটদের বই। 'প্রেতের হাসি', 'হসন্তের উপহাস', 'কবন্ধের প্রতিশোধ' ইত্যাদি ভুলভাষা, ভুল ব্যাকরণ দুষ্ট রংচঙে মলাটের প্রচুর বই। সাহিত্য বলে এইসব রোমাঞ্চিকাকে মর্য্যাদা দেওয়া চলেনা। আমরা ছেলেবেলায় কয়েকখানা ভাল ভাল শিশুপাঠ্য বই পড়েছিলাম, আজ সে সব বই বিলুপ্তির গহ্বরে। কদাচিৎ কোন বোদ্ধা প্রকাশক পুনর্মুদ্রণ করেছেন।

মাঝে মাঝে অবশ্যই ভাল ভাল শিশুসাহিত্য লেখা হয়। কিন্তু সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাছাড়া, ছেলেদের মতিও সস্তা লেখা বিগড়ে দিয়েছে। ঘুগ্‌নিদানা খাওয়া মুখে সন্দেশ ভাল লাগবে কেন?

ছোটমেয়েদের অবস্থা কিন্তু শোচনীয়। যদি বা ছেলেরা পড়ার যোগ্য কোন বই পায়, মেয়েরা কখনই পায়না। ছেলেদের জীবন ও তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত বইগুলোই বাধ্য হয়ে মেয়েদের পড়ে' যেতে হয়,—ভাল লাগুক বা নাই লাগুক। সাহিত্য জীবনের আয়না। সে আয়নায় সকলেই নিজের ছবি দেখতে চায়। ফলে, কেউ লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, আজকাল ছোট মেয়েদের মধ্যে বই পড়বার অভ্যাস ক্রমে চলে যাচ্ছে।

আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমাদের মেয়েরা বিদেশী মেয়েদের মতই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তাদের একটা সমগ্র জীবন আছে, উদ্দেশ আছে, আশা আছে। সে-জীবন ছেলেদের জীবন থেকে পৃথক। সে-জীবনের প্রতিফলন আজ সাহিত্যে আসুক। জগতের অন্যান্য দেশের মত এদেশেও ছোটমেয়েদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হোক। আমি এই বইটিতে সেই প্রাথমিক চেষ্টাই করেছি।

সকলেই জানেন বাল্যের অবসান ও যৌবন-প্রারম্ভের মধ্যের দিনগুলি বড় চমৎকার। জীবনগঠনের সূচনা থাকে ওখানেই। ওইসময়ে মেয়েরা সাধারণতঃ স্কুলে পড়ে। স্বাভাবিক নিয়মে স্কুলেই তাদের জীবন।

'হাসিকান্নার দিনে' চতুর্থশ্রেণী থেকে প্রথমশ্রেণী পর্য্যন্ত একদল মেয়ের জীবন প্রধানতঃ তাদের শিক্ষালয়ের পটভূমিকায় অঙ্কন করা হ'ল। চারজনের উপর বিশেষ আলোক-পাত করেছি। নায়িকা হিসাবে একজন প্রাধান্য পেয়েছে। মেয়েদের বাড়ীর আবহাওয়াও দেখাতে চেষ্টা করেছি।

একটি প্রায় আদর্শস্কুল কি রকম হওয়া উচিত, শিক্ষয়িত্রী ও মেয়েদের পরস্পরের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, গল্পচ্ছলে বলা হয়েছে। জীবন-গঠন বিষয়ে, জীবনের উদ্দেশ বিষয়ে, চরিত্রবিষয়ে নির্দ্দেশ দেবার প্রচেষ্টাও করেছি। বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে এ রচনার উপাদান সংগৃহীত। দোষ যা যা দেখেছি, তারও সংশোধন চেয়েছি।

উপন্যাসখানি উদ্দেশমূলকভাবে লেখা হয়েছে, শুধু একটি গল্প বলে যাওয়া লক্ষ্য নয়। সুতরাং, দোষগুণের বিচার করবার সময়ে সে কথা মনে রাখতে হ'বে। কখন কখন নীরস লাগলে অধৈর্য্য হ'লে চলবে না।

এখন বইখানি লিখে আমার দুর্ভোগ একটু বলি। মহৎ উদ্দেশে অনুপ্রাণিত হয়ে 'হাসিকান্নার দিন' লিখে চললাম। কিন্তু, বুদ্ধুভূতুম বিষণ্ণ মুখে প্রথমসংখ্যার কম্পোজ-করা প্রুফ নিয়ে এসে জানালেন যে, বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক কাগজের কর্তাব্যক্তি প্রথম কয়েকটি পাতা দেখেই আপত্তি জানিয়েছেন যে এমন অদ্ভুতধরণের উপন্যাস ছাপা উচিত হ'বে না। তখনও বই লেখা শেষ হয়নি। আমি বইটি শেষ করে তুলে রেখে দিলাম অপ্রকাশের নীরবতায়।

প্রায় একবছর পরে 'মৌচাক' শিশুপত্রের কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বইখানি চেয়ে নিয়ে তাঁদের পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। 'হাসিকান্নার দিনের' অধিকাংশই 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছে।

'মৌচাকে' 'হাসিকান্নার দিন' প্রকাশিত হ'বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। মেয়েরা আমাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল; জানাতে আরম্ভ করল, "ভারী ভাল লাগচে। এতদিন পরে সত্যই আমাদের পড়বার মত বই পেলাম।" আবার দু'একজন ছেলের মতামতও কানে এল. "এটা আবার কি রকম বই? ভূত নেই অ্যাডভেঞ্চার নেই, খুন-জখম নেই। একঘেয়ে স্কুল আর স্কুল! পড়তে ভাল লাগে না।" কয়েকটি ছেলে আবার মেয়েস্কুলের অন্ত-র্জীবনের গুপ্ততথ্য জানতে পেরে পুলকিত হ'ল। আমার বন্ধুরা জানালেন, "আবার পুরণো দিনগুলো ফিরে পেলাম।" আমার উদ্দেশ সফল হ'ল। আমি ছেলেদের জন্য বই লিখিনি—সস্তায় বাজার মাত করবার আশায়। তাদের খুব ভাল না লাগলে দোষ দেওয়া যায় না।

এর মধ্যে বইখানির আটের পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হওয়া মাত্র শিক্ষয়িত্রীমহলে তোলপাড় উঠল। মৌচাকের সম্পাদকের নামে,

আমার নামে কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নিজেরা অথবা অন্য কোন কর্ত্তাব্যক্তির দ্বারা চিঠি দিলেন। এই পরিচ্ছেদে কোন শিক্ষয়িত্রীর নিষ্ঠুরতা আঁকা হয়েছে। সে নাকি আমার পক্ষে গর্হিত অপরাধ।

আমার বই কেবল ছাত্রীর জন্য নয়, শিক্ষয়িত্রী ও অভিবাবকের জন্যও। বর্ত্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন এসেছে—তত্ত্ব ও তথ্য অনেক রূপ নিয়েছে। শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীর সম্পর্ক এখন অন্যপ্রকার হওয়া উচিত। সেই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রেখে 'হাসিকান্নার দিন' লেখা হয়েছে। শিক্ষয়িত্রীর দোষ দেখাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা আমি কোথাও করিনি। ছাত্রী বা শিক্ষয়িত্রী, কারুর ওকালতি করা আমার প্রতিপাদ্য নয়। শুধু ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর সম্পর্কের আদর্শরূপ কি তাই দেখাতে যেয়ে অযোগ্য শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষায় ত্রুটী কোথায়, গল্পের মধ্য দিয়ে ঈষৎ ইঙ্গিত করেছি মাত্র। শুধু ছাত্র ও শিক্ষকের সহযোগিতার অভাবে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই যে ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে, সে কথা স্পষ্ট করে বলবার জন্য যদি আমি অপরাধী হই, তাহ'লে এমন অপরাধ আমি সহস্রবার করতে প্রস্তুত আছি।

বাংলা সাহিত্যে হিতোপদেশের দিন নিঃসন্দেহে শেষ হয়ে গেছে। শুষ্ক নীতিমালায় উপদেশ না দিয়ে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় বর্ত্তমানের সাহিত্য যে নূতন রূপ নিয়েছে, সে রূপ হয়ত বহু পুরাতনপন্থীর চোখে ধরা পড়বে না। আমরা ছোটদের জন্য লিখলেও নূতনযুগের ছেলেমেয়ের জন্য লিখছি, একথা ভুললে চলবে না। পুরাতন প্রণালীতে পথনির্দ্দেশ তারা গ্রহণ করবে না। মানুষের আদর্শ বদলায় না, তবে বদলায় ভঙ্গি। নূতন ভঙ্গির পথও নূতন।

মানুষের চেতনায় আছে চিরন্তন বিদ্রোহ। শিশুর চেতনায়ও সে বিদ্রোহ ব্যাপ্ত থাকে। তাকে শান্ত করা যায় কেবল ভালবাসা দিয়ে। নবজাগৃতির সহায়ে এ বিদ্রোহ জোর করে দমন অসঙ্গত।

আজ শুধু শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিলেই চলবে না। শিক্ষকেরও ভেবে দেখার দিন এসেছে। এই নূতন যুগের কথা আমি বলব। এজন্য যদি আমার একটি বইও বিক্রী না হয়, সে ক্ষতি আমার সহ্য হ'বে।

অতঃপর 'মৌচাকের' কর্ত্তৃপক্ষ বইখানা তাড়াতাড়ি মধ্যপথে বন্ধ করে দিলেন অতি অসমাপ্ত-ভাবে। সম্প্রতি শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস বইটির নূতনত্বের কথা শুনে প্রকাশার্থী হয়ে ছোট মেয়েদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করেছেন।

'হাসিকান্নার দিনের' সামান্য কিছু অংশ বেতারে পঠিত হয়েছিল ও 'বেতার জগতে' প্রকাশিত হয়েছিল।

মেয়েদের জন্য লেখা বই তাদের ভাল লেগেছে, আমি জেনেছি। সমস্ত সার্থকতা এখানে। 'হাসিকান্নার দিন' যে যান্ত্রিক চিন্তাধারায় সামান্য একটুও বিপ্লব এনেছে, এজন্য বিরুদ্ধ সমালোচনাও আমার কাছে প্রীতিকর।

বাণী রায়

চারজন মেয়ে গাছের নীচে ব'সে। বড়রাস্তার ওপরে তাদের স্কুল, পেছনে ছোট মাঠ। মাঠের একপাশে একটা বাঁধানো জলাশয়, খুব ছোট। কল দিয়ে জল প'ড়ে ভরে যায়। সেখানে কাগজের নৌকা ভাসানো কিন্তু নিষেধ। জল নোংরা হয়ে যাবে। তবু দুষ্টু মেয়েরা, কিণ্ডারগার্ডেনের ছেলেরা যখন-তখন নেমে পড়ে। জামা কাপড়ও ভিজিয়ে ফেলে। ধরা পড়লেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস্ বাসুর কাছে শাস্তি। অনেক ফুলের গাছ আছে মাঠের মাঝখানে, তা-ও ছেঁড়া বারণ। কেবল মালী ফুল তুলে শিক্ষয়িত্রীদের কমন্-রুমে ও মিস্ বাসুর অফিস-ঘরের সঙ্গে লাগাও বসবার ঘরে তোড়া করে সাজিয়ে দেয়। বেশীর ভাগ মরসুমী ফুল—দু'টো-চারটে ভাল ফুল, যেমন গোলাপ ইত্যাদির গাছও আছে। বাস্কেট-বলের ছকও মাঠেরই একপাশে।

মাঠটাই স্কুল-জীবনের মধ্যমণি বললে ঠিক বলা হয়। এখানেই ব্যায়াম ও খেলা হয়। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা এখানে বাস্কেট-বল খেলে ; ছোটরা হাডুডু, চোর-চোর। শীতে রোদ পোয়ানো, গরমে বাসের প্রতীক্ষায় গাছের ছায়াতে বসে গল্পের বই পড়া, চীনা বাদাম খাওয়া, সবই এখানে চলে। ছাত্রীবাসের

মেয়েরা ভোরবেলা এখানেই পায়চারি ক'রে পরীক্ষার পড়া তৈরি করে। মেয়েদের গল্প-গুজব ঘুঁটীখেলা—এ-সব এখানেই হয়। স্কুলের টানা বারান্দায় গোলমাল করলে মিস্ বাসু বিরক্ত হন কিনা।

কলিকাতার এই নাম করা মেয়েদের স্কুলটিতে এখন জল-খাবারের ছুটি। টিফিন খাবার সিঁড়ির তলায় লম্বা সরু ঘর থেকে সারি সারি নানা পোষাকের, নানা বয়সের মেয়েরা খাওয়া-দাওয়া সেরে কলঘরে যাচ্ছে জল খেতে। কারুর খাবার এসেছে বাড়ী থেকে, কেউ টিফিনের কৌটো খুলে টিফিন খাচ্ছে; কেউ টিফিন-ঘরের খাবারওয়ালার কাছ থেকে কিনে নিচ্ছে। টিফিন-ঘরের একপাশে ঝুড়ি, খাবারের ঠোঙা, আবর্জনা তাতে ফেলতে হয়। ঘণ্টা শেষ হ'লে ঝাড়ুদার এসে ঝাট দিয়ে যায়। মিস্ বাসু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত ভালবাসেন। তাঁর দৃষ্টি সব সময় কোথায় কাগজের টুকরো, কোথায় একটা ছেঁড়া পাতা পড়ে আছে, সেই দিকে। হাতের কাছে কোন মেয়েকে দেখলে তক্ষুণি উঁচু-হীল জুতোতে খট্‌মট্‌ করে এসে তার ঘাড়ে-কাঁধে চড় দিয়ে ইংরেজি বাংলার জগাখিচুড়িতে বলেন, "তুলে ফেল দুষ্ট মেয়ে; এত নোংরা করেছ কেন?" মেয়েটি সে-কাগজের টুকরো বা ছেঁড়া পাতা এর আগে চোখে না দেখলেও তুলে ফেলতে বাধ্য হয়, যেন সে বেচারীই দায়ী!

"আচ্ছা ভাই, বড় হয়ে কি হ'ব?" টিফিনের ছুটিতে

সেই মাঠে, গাছের ছায়াতে ব'সে চারটি চতুর্থ শ্রেণীর মেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে। শীতের দিন, পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন কেবল ড্রইং, সেলাই, গান ইত্যাদির ছোট ছোট পরীক্ষাগুলো বাকী। রোজ সে-সব পরীক্ষা নেওয়া হয় না। তবু অধিকাংশ মেয়েরাই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের লোভে রোজই স্কুলে আসে। নিয়মিত প্রার্থনা হয়, খেলা, ড্রিল, গান শেখানো হয়। দু'একটা সাধারণ ক্লাসও মিস্ বাসুর তাড়নায় শিক্ষয়িত্রীদের নিতে হয়।

মেয়ে চারটির নাম—আরতি, চন্দ্রা, মঞ্জরী, নন্দিনী—ফোর্থ ক্লাসের অন্য মেয়েদের তুলনায় এরা কিছু পরিমাণে চিন্তাশীল। আমরা দেখতেই পাচ্ছি সেটা। না হলে কেন হুড়োহুড়ি—ছুড়োছুড়ি ছেড়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে পড়েছে।

মেয়েদের পরিচয় দিই। আরতি গরীব-ঘরের মেয়ে, দেখতে ফর্সা, লম্বা। পড়াশোনায় খেলাধূলায় বিশেষ ভাল। সব চেয়ে ভাল তার মিষ্টি স্বভাবটি। চন্দ্রা বড়লোকের মেয়ে, মনে ভাল হ'বার, বড় হ'বার, আকাঙ্ক্ষা আছে। মঞ্জরী সাধারণ ঘরের অসাধারণ মেয়ে। ক্লাসে তার চেয়ে ভাল মেয়ে আর নেই। নন্দিনী আধুনিক গৃহস্থ বাড়ী থেকে এসেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও লেখাপড়ায় মাঝামাঝি। সব কিছুতেই সে মাঝামাঝি। মেয়েদের বাড়ীর খবর পরে দেব। ক্রমে ক্রমে তাদের অন্য অন্য পরিচয়ও তোমরা পাবে।

ক্লাসের অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট সদ্ভাব আছে,

কিন্তু কোন বিষয়ে ভেবে দেখতে হলেই স্বাভাবিক ভাবে এরা আলাদা হয়ে যায়। এখনও তাই চারজনে আলাদা হয়ে বসেছে।

মঞ্জরী চট্ করে বলে উঠল, "আমি প্রসিদ্ধ হতে চাই।"

নন্দিনী চিপ্‌টেন কাটল, "কিসে প্রসিদ্ধ হবে? চুরি ডাকাতিতে কি?"

আরতি ধীরে ধীরে বল্ল, "প্রসিদ্ধ হলেই কি সুখ পাওয়া যায়?"

চন্দ্রা দু'চোখ বড় করে বললো, "মঞ্জু ঠিক বলেছে। খেয়ে প'রে তো সবাই বেঁচে থাকে। আমরা বড় হ'বো।"

একজনকে দলে পেয়ে মঞ্জুর একটু গর্ব হ'ল। গোলমুখটা আর একটু গোল করে, সোনার চশমার মধ্যে দিয়ে চেয়ে মঞ্জু বললো, "ভেবে দেখ, সবাই কত ভালো বলবে। চিরকাল মনে রাখবে। এই যে ফ্লরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ তিনি তো কবে মারা গেছেন। এখনও আমাদের বাংলা, ইংরেজি সব বইতে তাঁর কথা পড়তে হয়। আমার তো মনে হয়, অমন না হলে জীবনে লাভ নেই।"

আরতি চারজনের মধ্যে গম্ভীর, বুদ্ধিও তার পাকা। মঞ্জুর মাথা খেলে অন্য ব্যাপারে, সাংসারিক জ্ঞান নেই বল্লেই হয়। আরতি ভেবে-চিন্তে বললো, "একটা কিছু তো করতে হবে তোমার, নইলে শুধু শুধু নাম হ'বে কেন?—কি করবে?"

নন্দিনী মঞ্জুকে ভালবাসলেও, সব সময়ে সমালোচনা

করতো। আসলে তার ভক্তি ছিল আরতির ধীর-স্থির ব্যবহারে, শান্ত স্বভাবে। চঞ্চলা, অদ্ভুত প্রকৃতির মঞ্জু, একটু সাধারণের বাইরে। তাই তাকে সব সময়ে ঠিক বোঝা অত ছোট মেয়েদের সাধ্য ছিল না। সব বিষয় আরম্ভ করাতে মঞ্জু সকলের আগে বুদ্ধি দিতে পারতো, নানারকম কল্পনা মাথায় আসতো তার ক্রমাগত। তাই ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনী মঞ্জুকে অল্প হিংসেও করতো। সেটা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, মঞ্জুর একটু দোষ ছিল। সবাইকে সে নিজের মতে চালাতে ভালবাসতো। মতের অমিল হলে, বা কেউ তার কথা মানছে না দেখলে মঞ্জুর অমনি রাগ হয়ে যেত। এই উগ্র প্রকৃতির জন্যে কখনও কখনও বন্ধুরা মঞ্জুকে জব্দ করতে চাইতো। সেই দলে নন্দিনী ছিল প্রধান।

এখন মঞ্জুকে একটু জব্দ করবার লোভ নন্দিনী সামলাতে পারলো না, "হ্যাঁ, বলো না; কি করে নাম করবে? আমরা শিখে নি শুনে।"

মঞ্জু অপ্রতিভ হ'ল; ঠিক কি পথে গেলে 'যশের মন্দিরে' পৌঁছানো যায়, সে জ্ঞান তার নেই। মনে একটা আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, ওপরের দিকে ওঠবার ঝোঁক আছে, এই মাত্র। বন্ধুদের প্রশ্নে সে ছাড়া-ছাড়া জবাব দিতে লাগল, "সে ঠিক ভেবে নেব। তখন কি করলে বড় হওয়া যাবে, এখন কি করে বলি? একটা কিছু করবই।"

হঠাৎ মঞ্জুর মাথায় বুদ্ধি এলো। মুখ-চোখ জ্বলজ্বলে হয়ে

উঠলো তার। আরতির দিকে ফিরে আগ্রহের সঙ্গে সে বললো, "জানো কি করবো? একটা ষ্টুডিও খুলব। একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে আমি আর তুমি নিজদের কাজ করে যাব। আমি লিখবো, তুমি ছবি আঁকবে।"

মঞ্জু গদ্য-পদ্য দুই-ই ভাল লিখতো। বিশেষ করে, তার কবিতা পড়ে সকলে অবাক হয়ে যেতেন। আরতি ভাল ছবি আঁকতে পারতো। সে-ও গল্প কবিতা লিখতো, কিন্তু মঞ্জুর মত পারতো না। এরা দু'জনে একত্রিত হয়ে একখানা হাতে লেখা কাগজ বার করেছিল, নিজেদের ক্লাশ থেকে। সম্পাদিকা মঞ্জরী রায় হলেও, ক্লাশের সমস্ত মেয়েরই অত্যন্ত উৎসাহ ছিল কাগজটাতে। এটা তাদের গৌরবের বস্তু। রেণুকা ঘোষ নাম দিয়েছিল, 'আলো'। ভালো লাগায় 'আলো' নামই চলে গিয়েছিল। আরতির হাতের লেখা ভাল ছিল, সে ব'সে ব'সে কপি করত লেখাগুলো। মঞ্জু তাড়াতাড়ি লেখার জন্যে মুখে মুখে বলে যেত। হাতে-আঁকা ছবি দিয়ে বাঁধানো খাতায় এই 'আলো' জ্বালা হয়েছিল। কাজেই শিল্পচর্চা চতুর্থ শ্রেণীতে পুরোদমেই চল্‌তো। কাগজ বার করবার কল্পনাটাও মঞ্জুর মাথা থেকে এসেছিল।

মঞ্জুর আবার এই নূতন কল্পনা শুনে বন্ধুরা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো। মঞ্জু উৎসাহে ফুলে উঠে বলতে লাগলো, "সে বেশ হবে, ভাই। একটা দোতালা ঘর, সেইখানে আরতির ছবির সরঞ্জাম, আমার লেখার। দেখো, নাম হয়

কি না হয় ?—ভাই আরতি, তুমি ঠিক আসবে তো ?" মঞ্জু হাত ধরলো আরতির। স্নেহের দৃষ্টিতে আরতি তাকিয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ আসবো।"

"কথা দিলে তো ?"

"কথা দিলাম।"

চারজনের মধ্যে দু'জনের এই ভাগাভাগিতে বাকী দু'জন মনোক্ষুণ্ণ হয়ে বসেছিল, এখন মঞ্জু তাদের জিজ্ঞাসা করলো, "তোমরা দু'জন কি হবে ?" নন্দিনী ভেবে চিন্তে উত্তর দিল, "আমি বৈজ্ঞানিক হবো। সারাদিন কাজ করবো ল্যাবরেটারীতে, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে গল্পের বই পড়বো।"

বিবাহ-বিরোধী মঞ্জু বলে উঠল, "আমরা কেউ কিন্তু বিয়ে করবো না।" তাহ'লে ঘরকন্নায় ডুবে যাবো, কাজ করতে পারবো না।

চন্দ্রা রুমাল ঘষে ঘষে আঙুলের কালি তুলছিল। একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "তা কি করে হবে? মা বললে কি করবো ?" চন্দ্রার মনের কথা সে খুলে না বললেও আমি জানি। তার ইচ্ছা সে বড়-বাড়ীর গিন্নী হয়ে দামী গয়না-শাড়ী পরে প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে বেড়ায়। তাদের বাড়ী-গাড়ী থেকেও অনেক বড় বাড়ী-গাড়ী তার চাই। সেটা সম্ভব কোন বড়লোককে বিয়ে করতে পারলে।

মঞ্জু চন্দ্রার অনিচ্ছা বুঝতে পেরে উত্তেজিত হয়ে উঠলো,

"বিয়ে করলে কিছুই হবে না। আচ্ছা আরতি, এক কাজ করা যাক। আমরা একটা সমিতি খুলি, কি বল্? বিয়ে না করে জগতের কাজ করে যাবো।"

আরতি রাজি হ'ল। ক্লাসে মঞ্জু ও আরতিই ছিল দলপতি। তাদের কথাতেই সব হতো। মঞ্জু নন্দিনীকে আদেশ দিল, "সবাইকে ব'লে দাও, কাল টিফিনের সময় এইখানে জমা হতে।"

দুই

সেইদিন থেকে মঞ্জুর মনে একই ভাবনা তোলপাড় করে। নিরিবিলিতে বসলে সে ভাবতে আরম্ভ করে কেমন করে একটা ঘর নিয়ে আরতির সঙ্গে থাকবে। আর একটু বড় হলেই হয়। আচ্ছা, ষ্টুডিও মানে তো কাজের ঘর, ছবি আঁকার ঘরকে ষ্টুডিও বলে। লেখার ঘরকে কি বলে? ষ্টাডি? থাকগে, ষ্টুডিও বললেই চলবে। শোনামাত্র লোকে বুঝবে দু'টি বিখ্যাত শিল্পী এখানে বাসা বেঁধেছে। আরতি কি চমৎকার ছবি আঁকে! কি সুন্দর সুন্দর মিলিয়ে রঙ দেয়! ওই বিদ্যা মঞ্জুর হ'ল না। ছবি আঁকা পোষায় না তার, অত ধৈর্য নেই। রবার ঘষে ঘষে কাগজ আগে ক্ষয় করো, তারপরে ছবি। এর চেয়ে মঞ্জুর বিদ্যাই ভাল। কলম ধরলেই ঝর্‌ঝর্ করে লেখা যায়।

এধারে মঞ্জুদের নূতন সমিতি গড়া হয়ে গেল। সে কথা কিছু বলা দরকার। মঞ্জুর কথামত নন্দিনী মেয়েদের জলখাবার

ঘণ্টায় মাঠে জমা হ'তে বলে দিল। সবাই কিন্তু এল না; এরাও বিশেষ পীড়াপীড়ি করলো না; পেছনের বেঞ্চে-বসা সাধারণ মেয়েরা এদের দলে মিশতে সঙ্কোচ বোধ করতো। কয়েকজন মেয়ে এদের নিত্য নূতন মতলবকে হাসি ঠাট্টা করে আলাদা একটা দলমত গড়ে ছিল। কোন কোন মেয়ে সরাসরি কিছুতে যোগ দিতে ভালবাসতো না; তাই ক্লাসে আটত্রিশ জন ছাত্রী হলেও জন ষোল এল মাত্র।

এদের স্কুলে মিস্ বাসু এক শ্রেণীতে বেশী ছাত্রা ভর্ত্তি হ'তে দিতেন না, পড়াশুনা খারাপ হবে ব'লে। ফলে স্কুলটির উন্নতি হয়েছিল যথেষ্ট। চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল ছত্রিশ জন মেয়ে ও দু'টি ছেলে। মেয়ে-স্কুলে পড়বার বয়স তাদের পার হয়ে যাচ্ছিল। এই মেয়ে-স্কুলে ওদের শেষ বছর। আদৌ মেয়ে-স্কুলে পড়বার ইচ্ছা সুখময় ও প্রভাতের ছিল না। কিন্তু দিদি-মাসী-পিসি সবাই এখানে পড়ে। তাই যতদিন চালানো যায় ততদিন চলুক।

ছেলে দু'টি পেছনের একখানা বেঞ্চে 'হংসমধ্যে বকো যথা' ভাবে বসে থাকতো। এদের মুখ দেখলে অতি বড় নিষ্ঠুর লোকেরও দয়া হতো। এতগুলো মেয়ের সঙ্গে বারো বছর বয়সে পড়বার লজ্জা তারা কিছুতেই ভুলতে পারতো না। বেচারীদের পড়াশুনা পর্যন্ত ঠিক ঠিক হতো না।

ষোলজন মেয়ের সভায় মঞ্জু নিঃসন্দেহে সভানেত্রী হ'ল। একখানা বড় চৌকো কাঠের ফ্রেম পড়েছিল বাগানের বেড়ার

পাশে, বেশ পোক্ত মজবুত। তার উপর সবাই বসলো। মঞ্জু বলতে আরম্ভ করল ঃ—

"আমি বলছি আমাদের জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা উচিত—এই মলিনা, তুমি শোন—। আমরা কি কুকুর বেড়ালের মত খেয়ে পরে বেঁচে থাকবো ? বড় হ'ব না, কারোর কোন কাজে লাগব না ?—আঃ নীলিমা, কথা বলছো কেন ?—তাই আমি বলি আমরা একটা সমিতি খুলি নিজেদের মধ্যে। রাজা আর্থার তাঁর নাইটদের নিয়ে 'রাউণ্ড টেবিলে'র বৈঠক খুলেছিলেন, তোমরা জানো। আর্থার ছিলেন সেকালের বৃটিশ রাজা। একখানা গোলটেবিল ঘিরে বাছা বাছা বীর যোদ্ধা বসতো, যা'তে সকলে সমান বোঝায়। যোদ্ধারা ছিলেন আর্থারের রাজসভার 'নাইট'। এঁরা আশ্চর্য মহৎ কাজ করে গেছেন। পবিত্র জীবন এদের যাপন করতে হতো।—বীণা, শুনছো না কেন ?—আমরাও আজ থেকে এইখানে সমিতি খুলি। নাম হোক আমাদের 'স্কোয়ার টেবিলের নাইট', কারণ যে ফ্রেমে বসেছি আমরা, সেটা চৌকো।"

সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করল, রেণুকা ঘোষ বাদে। কেন জানি না, মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে রইলো।

তারপর নানা রকম আলাপ-আলোচনা হ'তে লাগলো। রোজ রোজ টিফিনের সময় এই কাজে জমা হতে কেউ কেউ আপত্তি করাতে রোজকার ব্যবস্থা উঠিয়ে সপ্তাহে তিন দিন রাখা গেল। শনি-রবিবার স্কুল বন্ধ। সে দু'দিন সারা সপ্তাহের

কাজকর্ম ও ভাবনা চিন্তার নোট করতে হবে একখানা খাতায়। সুতরাং একখানা খাতা আজই বাড়ী যেয়ে কিনে ফেলতে হবে। মহা আনন্দে মেয়েরা রাজী হ'ল। কাজ যে কী ধরনের ক'রে 'চৌকো টেবিলে'র নাইট হতে হ'বে সে ধারণা কারুর স্পষ্টাস্পষ্টি নেই, দেখা গেল। এমন কি এ পরিকল্পনা যার মগজে জন্মেছে, সে মঞ্জুরও নয়। তবে রাজা আর্থারের গল্প তারা জানে, 'High Roads of History' বইখানাতে ভাল করেই পড়েছে। আর্থারের নাইট গ্যালাহাড, লন্সেলট এদের নাম জানে। 'Quest of Holy Grail'-এর গল্প, ইংরাজ কবি টেনিসনের লেখা রাজা আর্থার ও তাঁর নাইটদের কথা মিস্ বাসু গল্পে গল্পে এদের জানিয়েছেন। মিস্ বাসুর এই একটা গুণ ছিল। তিনি মেয়েদের বাইরের বই সম্বন্ধে বলতেন, তাই তাঁর স্কুলের মেয়েদের বাইরের জ্ঞান অন্য স্কুলের মেয়েদের থেকে বেশী ছিল। বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর মেয়েরা অন্য শ্রেণীর মেয়েদের থেকে অনেক বেশী জানতো ও বুঝতো ব'লে উনি তাদের শ্রেণীতে বেশী বেশী করে বাইরের কথা বলতেন।

তাই রাজা আর্থারের নজিরে নাইটদের দল গড়া এদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হ'ল না। এমন কি পুরুষ নাইটদের রাতারাতি মেয়ে করে তোলার কল্পনাও কারুর কাছে অস্বাভাবিক লাগল না। পরের উপকার, সকলের ভাল করতে হবে, এটুকু তারা বুঝতে পারলো। অবশ্য ঠিক কোন

পথে গেলে সে সব করা যাবে সে ধারণা তাদের না থাকলে কিছু বলবার নেই।

মঞ্জু আরতিকে ইশারা করলো,—"বল এইবারে।" আরতি গলা ঝেড়ে নিল। মঞ্জুর মত বক্তা সে নয়।—"শোন মেয়েরা, একটা কথা। বিয়ে না করে থাকতে হবে নাইটদের মত।"

মঞ্জু সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। ঝোঁকের মাথায় সকলেই রাজা হ'ল। কয়েকজন প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত ক'রে ফেললো। শুধু চন্দ্রা চুপ করে রইলো।

মঞ্জু কড়া-গলায় প্রশ্ন করলো, "চুপ ক'রে আছো কেন, চন্দ্রা? মানে, তুমি বিয়ে করবে?"

সকলেই চন্দ্রার দিকে অনুযোগের দৃষ্টিতে চাইলো। চন্দ্রা মরিয়া হয়ে বললো, "বারে, আমি কি করবো—আমাকে মা বল্লে তো করতেই হবে।"

মঞ্জু হঠাৎ চটে উঠলো, "মা বল্লেই করতে হবে! কেন? আমাদের মা নেই?"

মঞ্জুকে সায় দিয়ে মিনতি বল্‌লো, "তবুতো তোমার বাবা নেই, একা মা। আমাদের মা-বাবা দু'জনেই তো আছেন। দু'জনেই বলবেন। তখন?"

চন্দ্রার বাবা ছিলেন না, কিন্তু ভাইদের সংসারে মায়ের প্রতাপ ছিল। ওরা কটি বোন মায়ের আওতায় থাকতো।

মিনতির কথায় চন্দ্রার মুখখানা ভারী হ'য়ে উঠলো। সত্যি

তো, তার বাবা নেই। আহা, যাদের বাবা আছেন, তাদের কত সুখ! আরতি তাড়াতাড়ি মিনতির বোকা কথা সামলে নিল,—"আহা, ঝগড়া থাক্। মঞ্জু, নীলিমা যাচ্ছে কোথায়?" সকলেই কথায় ব্যস্ত ছিল। এখন তাকিয়ে দেখল ছোট, মোটাসোটা নীলিমা লম্বা বেণী দুলিয়ে উঠে যাচ্ছে। সবাই চীৎকার করে উঠল, "ও ভেড়ু, ভেড়ু! যাচ্ছ কোথা?"

নীলিমা ভাল গান গাইতে পারলেও তার কথার গলা মোটা ছিল। একদিন খেলার মাঠে অসম্ভব জোর চীৎকার করছিল। মঞ্জু বলেছিল "এই ভেড়া, চুপ কর।" সেই থেকে তার আদরের নাম হয়েছে—'ভেড়ু'।

নীলিমা চোখ ঘুরিয়ে বললো, "বসে থেকে থেকে গলা কাঠ হয়ে গেছে। জল খেতে যাচ্ছি।"

জলের নামে অনেকের তেষ্টা পেয়ে গেল। অনেকে 'গলা কাঠ' হয়েছে বুঝলো। মঞ্জুর নিষেধ সত্ত্বেও সভা ভেঙে গেল। সবাই উঠে যেতে লাগলো! অগত্যা মঞ্জু, আরতি, নন্দিনী, চন্দ্রা এরাও উঠলো।—কলঘরের মুখে নীলিমার সঙ্গে দেখা। ভিজে শানে থ্যাবড়া জুতো থপ্ থপ্ করে, হাঁড়িমুখে সে ফিরছে। এদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে বলে উঠলো, "ভাই, সর্বনাশ হয়েছে!"

"অ্যাঁ, কি, কি?"...

"ডাক্তার সিং স্বাস্থ্য বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন প্রার্থনার

বড়ঘরে। ঘণ্টা পড়লেই সবাইকে যেতে হবে। আমাকে মিস্ বাসু বলে দিলেন।"

"পড়ে মরতে মিস্ বাসুর সামনে তুমি গেলে কেন? নইলে বলা যেত আমরা মাঠে খেলা করছিলুম, কিসের ঘণ্টা পড়েছিল বুঝিনি।" গৌরী বিরক্ত হয়ে বললো।

"বাঃ, আমি গেলাম বুঝি? আমাকে জল খেতে দেখে, উনি 'এই, এই' করে ডাকলেন না?" নীলিমা কাঁদ কাঁদ হয়ে উত্তর দিল।

"এখন বাজে বক্তৃতা শুনে মরগে সবাই।" রেণুকা লাহিড়ী বললো। ক্লাসে তিনটি রেণুকা, তিনটি বীণা, দুইটি নীলিমা।—এক নামে একের বেশী মেয়ে আছে।

দেখা গেল বাথরুমের সামনে চাবাগাছের বেড়ার কাছে রেণুকা ঘোষ খুব বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"কি হয়েছে ওর?" চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলো।

"কি হয়েছে রেণু?" সবাই ওর কাছে এগিয়ে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

"তখন আমি যেই মঞ্জুর কথায় হাঁ করে 'হ্যাঁ' বলতে গেছি, অমনি ঘাসের ওপর থেকে একটা সবুজ পোকা লাফিয়ে উঠে আমার গলার মধ্যে ঢুকে একেবারে পেটে চলে গেল। উঠে এসে কত চেষ্টা করলাম, কিছুতেই বার হচ্ছে না।" রেণু বললো।

"সে এতক্ষণ হজম হয়ে গেছে।" মিনতি সবজান্তা ভাবে বললো।

"না ভাই, কি হ'বে? যদি কোন বিষাক্ত পোকা-টোকা হয়?" রেণু বেচারীর চোখে জল আসে আর কি।

"কোন ভয় নেই রেণু—চল কলঘরে, দেখিগে।" আরতি রেণুর হাত ধরে টানলো, মঞ্জু তার মাথায় চড় মারতে লাগলো পোকাটা বের করে ফেলতে। চন্দ্রা হাঁ করিয়ে গলার মধ্যে উঁকি দিতে লাগলো। মোটের উপর রেণুকে নিয়ে একটা হৈ-চৈ চললো।

এ সময়ে দেখা গেল মাঠ পেরিয়ে আসছে দুটি ছেলে—সুখময় ও প্রভাত। একজন কালো, একজন ফর্সা। একজন হাবা মত দেখতে, অপরজন তুখোড় মত। দু'জনেরই কোট ও লম্বা ট্রাউজার পরা। ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে আসছে তারা, যেন শত্রুপুরীতে বন্দী। নীচু নীচু ক্লাসে অবশ্য বহু ছেলে, কিন্তু এরা তাদের সঙ্গে মেশে না।

মিনতি বললে, "আহা, মরে যাই! আমাদের দেখে হাসছে দেখ?"

রেণুকা ভাদুড়ী ফর্সা বেঁটে মেয়ে, ডিমের মত মুখ। চোখে সোনার লম্বা ছাঁদের চশ্‌মা পরে, কথা কম বলে। এখন বললো, "রেণুর গলায় পোকা গেছে শুনে হাসছে!" হঠাৎ এত লোকের মধ্যে নিজের থেকে কথা বলে ফেলে ওর ফর্সা মুখটা টুকটুকে হয়ে উঠলো। খেলাধূলোয় মিনতি, গৌরী, নীলিমা সেরা মেয়ে। বিশেষতঃ, শ্যামবর্ণ ছিপছিপে মিনতি আর সুন্দরী গৌরী 'গুণ্ডা মেয়ে' বলে খ্যাতি পেয়েছিল। আরতি,

চন্দ্রা, নন্দিনী, এরা স্পোর্টে ভাল হ'লেও দুষ্টুবুদ্ধিতে অগ্রণী ছিল না। এখন মিনতিই এগিয়ে গেল, বড়দের অনুকরণ ক'রে গম্ভীর স্বরে ধমক দিল, "ওহে ছোকরারা, হাসছো কেন?"

ভালমানুষ সুখময় একটু ভ্যাবাচাকা খেতে না খেতে প্রভাত চট্ ক'রে উত্তর দিল, "তাতে তোমাদের কি?" এমনি সামান্য খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি চলতে না চলতে 'হস্ত থাকিতে কেন মুখে কহ কথা?' অর্থাৎ ছেলেমেয়েতে মারামারি বেধে গেল। ছেলেরা দুটি মাত্র, এধারে মেয়ে বহু। তবে সবাই যোগ দেয়নি, দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। মঞ্জু দুরন্ত হ'লেও মারামারি দেখে ভয় পেত। চন্দ্রা অতি সভ্য, আরতি অতি ভাল। কিন্তু নন্দিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো। মিনতি, গৌরী, নীলিমা, রেণুকা লাহিড়ী এরা নন্দিনীর নেতৃত্বে সহজে ছেলেদের হারিয়ে দিল। সে কি মারামারি! ঢিল-ছোঁড়া, ঘুষি, চড়, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া। ছেলেদের মাথার ছোট চুল, মেয়েদের লম্বা বেণী বুঝিবা টানের চোটে উপ্‌ড়ে আসে। কতক্ষণ মারামারি চলতো কে জানে? কারণ, মেয়েদের হাতে মার খেয়ে কোন ছেলে সে মার হজম করতে পারে বলে আমরা জানি না। এক শুনেছি বর্মা মুল্লুকে এটা চলে। কিন্তু এধারে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো—স্বাস্থ্যের বক্তৃতা শুনতে মেয়েরা জড় হল। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে যুদ্ধটা মিটে গেল।

গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে ছেলেরা শাসিয়ে গেল, "মিস্ বাসুকে বলে দিয়ে মজা দেখাচ্ছি।"

সত্যি সত্যি তারা মিস্ বাসুর ঘরের দিকে রওনা হ'ল। মেয়েদের মুখ শুকিয়ে গেল। মিস্ বাসুকে সকলে যমের মত ভয় করত।—"কি হবে ভাই?" তারা বলাবলি করতে লাগল। মিনতি মুখে সাহস দেখাল, "যা হ'বার হ'বে।—যা পারে করুকগে!"

গৌরী বলল, "বাঃ ওরাইতো আগে লাগল!"

মঞ্জু তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, "প্রথম ঢিলটা তো ওরাই ছুঁড়েছিল, না?"

এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। প্রথম ঢিলটা কিন্তু ছুঁড়েছিল নন্দিনী। সুখময়, প্রভাত অত বোকা নয়। এতগুলো মেয়ের মধ্যে তারা মৌচাকে ঢিল ছুঁড়তে সাহস পাবে না।

সকলে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে তারা হলঘরের দিকে অনিচ্ছুক ভাবে চলতে আরম্ভ করল। তারা মারামারি কখনই করে না। ছেলেদের সঙ্গে দু'একবার অবশ্য হ'য়েছে, কিন্তু কোনবার কেউ নালিশ করতে যায়নি। এবারে মারটাও দেওয়া হয়েছে বেশী। সুখময়ের জামার কলার ছিঁড়ে গেছে। এখন কপালে কি আছে কে জানে? মিস্ বাসুর শাস্তির ভাণ্ডারে কত নূতন শাস্তি থাকে, তার হদিস পাওয়া যায় না। নাঃ, রাজা আর্থারের নাইট হয়ে তাদের মাথা গরম হ'য়ে গেছে! এখন কি বিপদ উপস্থিত হ'ল! এই নূতন বিপদে রেণু ঘোষও তার পুরাণো বিপদ, অর্থাৎ গলায় পোকা-প্রবেশ বেমালুম ভুলে গেল।

কিছুদূর যেতে না যেতে পেছন দিক থেকে একটি ছোট্ট-খাট্টো মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল, "এই শোন, কি হয়েছে।—মিনতি, কি মজা হয়েছে শোন।"

মেয়েটি নিজে ছোট হলেও নামটি ছিল তার প্রকাণ্ড। তার নাম নিয়ে হাসাহাসি চলত। বয়সেও সে সবার ছোট ছিল। তার নাম ছিল সুপ্রেক্ষিতা। সবাই ঠাট্টা করত, নিশ্চয় ওর ছোট বোনের নাম 'অপ্রেক্ষিতা'। কিন্তু ওর ছোট বোনের নাম ছিল 'সুবিনীতা'। মিনতিকে বিশেষ করে সুপ্রেক্ষিতা ভালবাসত। সব সময় তার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াত। মিনতি তাই একদিন ঠাট্টা করেছিল, "এইটুকু মেয়ে তুই সুপুরির মত,—বড়দের কথায় থাকিস যে বড় ?"

অত বড় 'সুপ্রেক্ষিতা' নাম সেই দিন থেকে ভেঙে 'সুপুরি' হ'য়ে গিয়েছিল।

মিনতি ফিরে বলল, "দেখ, সুপুরিটা আবার কি খবর আনছে।"

সবাই দাঁড়াল। সুপুরি সংবাদ দিল যে, সে চুপিচুপি প্রভাত-সুখময়ের পেছনে যেয়ে মিস্ বাসুর ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফলাফল শুনেছে। ছোট্ট মানুষটি, গোপন কাজে দৌত্য তার পক্ষেই সম্ভব। ছেলেদের নালিশে মিস্ বাসু কাণ তো দেনই নি, উল্টে তাদেরই বকেছেন। মেয়েদের মার খেয়ে যে ছেলে নালিশ করতে আসে, তাদের 'সিসি' বলা হয়।

এক মিনিটে সবাই জ্বল্‌জ্বলে হয়ে উঠলো। মিনতি আনন্দে সুপ্রেক্ষিতার পিঠে সজোরে এক চড় মেরে বল্ল, “আরে সুপুরি, জিতা রহো।” বেচারী সুপুরির পিঠের অবস্থা এ হেন আদরে শোচনীয় হলেও, সে হাসিমুখে মিনতির গা ঘেঁষে প্রার্থনার বড় ঘরের দিকে চলতে আরম্ভ করলো। সেখানে যেয়ে মেঝেতে পাতা শতরঞ্জে সকলে বসবার একটু পরে মিস্ বাসু ডাক্তার সিংহ ও অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের নিয়ে এলেন। এ স্কুলে গান আর ছবি আঁকা ছাড়া সব কিছু মেয়েরা শেখান। তবে অফিস কমিটিতে পুরুষ আছেন। কখনো কখনো তাঁরা কোন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ডাক্তার সিংহ ছাত্রীবাসের মেয়েদের দেখেন ও মাঝে মাঝে মিস্ বাসুর পাল্লায় পড়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল রাখা সম্বন্ধে বক্তৃতায় উপদেশ দেন।

মিস্ বাসু একবার মর্মভেদী দৃষ্টিতে চতুর্থ শ্রেণীর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সামনে সাজানো চেয়ারে বসলেন। বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। মস্ত মস্ত কাঁচের জানালা দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ সোনার মত লাল পাথরের মেঝেতে, নীল শতরঞ্চে লুটিয়ে পড়ছে। দেয়ালে টাঙানো ভাল ভাল ছবি। বেশীর ভাগ প্রাকৃতিক দৃশ্যের। একপাশে অর্গান, অন্যপাশে ছোট কটেজ পিয়ানো। মধ্যখানে বাঁধানো মঞ্চ। অভিনয় বা কোন অনুষ্ঠানের সময় দরকার হয়। ঘরে অনেক দরজা, কাঁচ-কাঠ দু’য়ের পাল্লা আছে। ফাঁক দিয়ে মাঠ, ফুলের

গাছ কাটা-কাটা রূপে দেখা যায়। হলের শেষ দরজা ছাত্রীবাসে চলে গেছে।

রোদের আভা মিস্ বাসুর যত্নে সাজানো চুলে পড়েছে। বয়স তাঁর বেশী নয়, বিদেশ থেকে ভাল ডিগ্রীর জোরে এই স্কুলে অনেক মাইনের কাজ পেয়েছেন। চেহারা ভাল, বেশভূষা একটু ইঙ্গ-বঙ্গ ভাবের। তখন তো সে ধরণের পোষাকের আদর ছিল। সোনালী চুল, গোলাপী গায়ের রঙ, রেশমের জামা-কাপড়, হাতের প্লাটিনামের হীরা বসানো আংটী, শূণ্য কব্জীতে বাঁধা ছোট মণির মত ঘড়িটি—সব মিলিয়ে তাঁকে দেখতে ভাল লাগত। চটপটে, ঝকঝকে মানুষ। সব সময় স্কুলের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিসে স্কুলের উন্নতি হবে, কিসে মেয়েরা ভাল হবে। নিজে কাজের লোক, এক মিনিট চুপ করে থাকতে পারেন না। নানা রকম পরিকল্পনা মাথায় ঘুরত এবং সে সব কাজে খাটাবার জন্য মেয়েদের ও অন্য শিক্ষয়িত্রীদের পীড়ন করতেন। সময় সময় লোকে তাঁর ওপর অত্যন্ত চটে যেত। কিন্তু ভবিষ্যতে মেয়েরা বুঝেছে যে তিনি তাদের সর্বদা তাড়না করে করে কত উপকার করেছেন।

মিস্ বাসু বক্তৃতা সুরু হবার আগে মেয়েদের দুটো একটা কথা বলে নিলেন। তিনি বেশীর ভাগ ইংরেজীতে বলেন, মাঝে মাঝে বাংলা মিশিয়ে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মেয়েদের যত্ন নেওয়া উচিত এই কথা বলে বললেন, "কিন্তু গায়ে জোর থাকলেও তার

খারাপ প্রয়োগ উচিত নয়। মেয়েদের বিদ্যালয়ে মারামারি আমি চাই না। ছেলে-মেয়েতে মারামারি আরও বিশ্রী। আমি নাম করতে যাচ্ছি না এবারের মত। কিন্তু এই ঘটনা আমার কাণে এসেছে। বড়ই দুঃখিত হয়েছি শুনে। যারা একাজ করেছে,—(তাঁর দৃষ্টি মিনতি, গৌরী, নীলিমার মুখে) তাদের এবার কিছু বলব না। ভবিষ্যতে এরকম যেন না হয়।" ..

"এবার মেনকা, একটা গান।—না না, উঠতে হবে না, বসে গাও।" মিস্ বাসু আদেশ দিয়ে চেয়ারে বসলেন। এ স্কুলে সবটাতেই গান, যে কোন ব্যাপারই হোক। ব্রাহ্ম মন্দিরের প্রথায় ধর্ম-ঘেঁষা সঙ্গীত দিয়ে প্রতিটি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মিস্ বাসু নিজে ধার্মিক না হলেও পুরণো এসব নিয়মে হাত দেন নি। সুতরাং আজও প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে মেনকা ওরফে মিনুকে গান ধরতে হ'ল বাঁশীর মত মিষ্টি গলায়। দাঁড়িয়ে উঠেছিল সে, বসে পড়লো। লালপাড় শাদা শাড়ী, ছাপা জামা। রেশমের মত নরম চুলের বেণীতে বেগুনী ফিতে বাঁধা। বড় চোখ, লাল ঠোঁট, ফর্সা রঙ। মিনু গান ধরলো—"হে সখা মম হৃদয়ে রহ।

সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে

হৃদয়ে রহ।"...

সম্মুখের চেয়ারে সারি সারি শিক্ষয়িত্রীরা বসেছেন। গানের পরে ডাঃ সিংহ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ করলেন। এর

মধ্যে আমি শিক্ষয়িত্রীদের একটু পরিচয় দিই,—বিশেষ করে ফোর্থ ক্লাসে যাঁরা পড়ান।

পুরু কাঁচের চশমায় বড় বড় চোখ ঢাকা, সবুজ-লাল পাড়ের শাদা ধনেখালি শাড়ী শাদা করে পরা, যিনি বসেছেন, তিনি অঙ্কের কৃষ্ণাদি, সবাই যমের মত ভয় পায়। তাঁর দুই পাশে তাঁর দুই বন্ধু। সংস্কৃত পড়ান দীপ্তিদি, শ্যামল রঙ, অনেক চুল আঁট হাতখোঁপায় বাঁধা। মেয়েদের ভাষায় খুব 'ষ্ট্রীক্‌ট্ টীচার'। অন্যদিকে বাংলার শিক্ষয়িত্রী কণিকাদি। ভাল মানুষ, গোল মুখ। ভূগোল পড়ান প্রভাদি। মধ্য বয়সী, মোটাসোটা গোছের। ব্রাহ্মিকা ধরণে শাড়ী পরেন, কাঁধ ঝাঁকিয়ে কথা বলেন। ইতিহাস, ইংরেজীর ভার মিস্ দত্তের উপর, কালো তেজী চেহারা। কড়া মেজাজে তাঁর সবাই তটস্থ। চেয়ারে বসে গোলাপী উল বুনে যাচ্ছেন মিসেস্ মুখার্জী। ইংবেজি অনুবাদ করান। ফিট গৌরবর্ণ, বিধবা মানুষ। শাদা ধব্‌ধবে থান পরা, পুরোহাতা জামা গায়ে,—উলের থলে হাতে রয়েছে সব সময়। গাড়ীতে যেতে বা ক্লাসে মেয়েদের কাজ করতে দিয়ে কাঁটা-পশম বার করে বুনে যান একমনে। জীবনে বহু দুঃখ পেয়েছেন। তাই মাঝে মাঝে চুপ করে নিজের মনে বসে থাকলেও 'হায় হায়' করে অজানিতে হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। স্বামী গেছেন; উপযুক্ত ছেলে গেছে। তারপর থেকেই কেমন হয়ে গেছেন তিনি! টাকার দরকার নেই, ভুলে থাকতে পারবেন বলেই

স্কুলে পড়ানো। ছোট ছোট মেয়েরা তাঁর দুঃখ বুঝতে পারত না, তাই ওই 'হায়, হায়' রব শুনে হেসে ফেলত। সত্যি, না বুঝে ছেলেবেলায় আমরা কত নিষ্ঠুর থাকি!

একদিকে কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী জড়সড় হয়ে লাজুকভাবে বসে আছেন। তাঁরা এককালে এই স্কুলেই পড়তেন, পুরণো শিক্ষয়িত্রীদের ছাত্রী ছিলেন। তাই তাঁদের সামনে ছাত্রীভাব এঁদের ঘোচেনি। নূতনদের কাছে পড়তে ছাত্রীরা চাইত। কারণ এঁরা এখনো হাসিখুসি আছেন। মেয়েদের দুষ্টুমি দেখে বকতে পারেন না, হেসে ফেলেন।

যাক্, সমস্ত শিক্ষয়িত্রীদের পরিচয় দিয়ে তোমাদের সময় নষ্ট করব না। যাঁদের পরিচয় পাবার, তাঁদের তো পাবেই। স্বাস্থ্যের বক্তৃতা তোমাদের ভাল লাগছে না, জানি। কারণ, ওই দিন মেয়েদেরও ভাল লাগে নি। মিস্ বাসুর ভয়ে তারা চুপ-চাপ বসে আছে। সমস্ত ঘরে গম্ভীর আবহাওয়া। এদিনের এখানেই পর্দা টানি।

তিন

অনেকগুলো চিঠি। ক্লাসের মেয়েরা মঞ্জুকে লিখেছে। মঞ্জু জ্বরে পড়ে তিন চারদিন যেতে পারছে না। ইতিমধ্যে তারা তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। মঞ্জু প্রথম হয়েছে। আরতি দ্বিতীয়। কয়েকদিন বাদে পারিতোষিক দেওয়া হ'বে। নূতন ক্লাস আরম্ভ হ'য়ে গেছে। চক্‌চকে বই পেয়ে মেয়েরা সত্যি সত্যি পড়াশুনায়

মন দিয়েছে। মঞ্জুর সামনের বাড়ীতে একটি মেয়ে ঐ স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়তো—ঝাঁকড়া চুল মাথায়, নাম টুনু। বয়সে কিছু ছোট হ'লেও মঞ্জুর বন্ধুর দলে ছিল। মঞ্জু ভর্তি হয়েছে দেখে কেঁদেকেটে বেচারা ওই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। সবে স্কুলে ভর্তি হ'য়ে মঞ্জু বেশ গুরুগম্ভীর চালে কিছুদিন বাড়ীতে চলাফেরা করতো। টুনু বেচারী আমল পেত না। হঠাৎ একদিন ক্লাসের জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে মঞ্জু দেখলো ন্যাড়া মাথা লিক্‌লিকে টুনু ছোট ক্লাসের মেয়েদের দলে রুমাল-চোর খেলা খেলছে। চেয়ারে সেই শ্রেণীর শিক্ষয়িত্রী বসে। "আরে, টুনুটা কেমন এসে ভর্তি হয়েছে! আগে কিছু বলেনি তো?" মঞ্জু ভাবল।

এই ভক্ত টুনুর হাতে চিঠির তাড়া চলাচলি করছে। প্রায় সকল বন্ধুরাই খাতার পাতা ছিঁড়ে পেন্সিলে ক্লাসের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মঞ্জুকে চিঠি লিখত। বেশীর ভাগ কথা থাকত তাতে পড়ার। কতটা পড়া হ'ল আজ, কাল কতটা পড়া হবে এই সব কথা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নূতন বই খুলে খুলে মঞ্জু মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতো। কি সুন্দর ঝক্‌ঝকে বই সব! বিলিতী ছাপা-ছবিতে ইংরেজী বইগুলি কি মসৃণ। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে সখ হয়। বইগুলোতে গল্প-সল্প যা আছে সবই মঞ্জুর শেষ হয়ে গেছে। এখন সে বাংলা-সঞ্চয়ন পড়ছে।

টুনুর চাকর চিঠি দিয়ে গেল একতাড়া। যারা যারা সময় পেয়েছে লিখেছে। যারা পারেনি তারা অন্যদের চিঠির মধ্যে

দু'এক লাইন যোগ করে দিয়েছে। রেণু ঘোষের চিঠিটা শোন: "ভাই মঞ্জু, আরতি তোমাকে সব পড়া লিখে দিয়েছে। আমি আর লিখলাম না। আজ সবাই আসেনি। চন্দ্রার দাদার বিয়ে। তাই ও আসেনি। এখন হিষ্ট্রি। আর লিখতে পারলাম না। মিস্ দত্ত এদিকে তাকাচ্ছেন।—রেণু।"

চিঠিখানা পড়ে মঞ্জুর হাসি পেল। রেণুটার অবস্থা ভেবে সে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠলো—সর্দি-জ্বরের গলায় চাপা-হাসি কাশির মত শোনাল।

বারান্দায় বাঘ-আঁকা মাদুরে মঞ্জুর মা বসে বসে হেমচন্দ্রের লেখা কাব্য 'বৃত্রসংহার' পড়ছিলেন। মঞ্জুর খ্যাক্ খ্যাক্ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে এসে পায়ের দিকের জানালাটা সজোরে বন্ধ করে দিলেন।—"যা ভেবেছি তাই। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে কাশিটা বেড়ে গেছে। তখনি বললাম, জানালা খুলে রাখিসনে।" মঞ্জু প্রতিবাদ করল, "মোটেই আমি কাসছি না।" "না, তা কি আর?—কপালে ভোগ রয়েছে আমার!" মা মঞ্জুর গায়ে চেক্ সুজনিখানা ঢেকে দিলেন। বন্ধ ঘরে সুজনি-চাপা হয়ে মঞ্জুর দম আটকে আসতে লাগল। কিন্তু সে হাসির কারণ মাকে বলতে পারলো না। তিনি কখনও বুঝবেন না। বড়রা কখনও বোঝে না।

মঞ্জু অনুনয় করল, "একটু বসো না, মা। ভাল লাগছে না একা একা।" ভাইরা মঞ্জুর থেকে অনেক বড়, বোন নেই। মা ঘরের কাজকর্মের অবসরে বই-টই পড়েন।

তাই বাড়ীতে মঞ্জু একা। এজন্য তার বাড়ী থাকতে একটুও ভাল লাগত না। স্কুলে কত বন্ধু! নেহাৎ শুয়ে না থাকলে মঞ্জু কখনও স্কুল কামাই করত না। স্কুল কামাই করা তার পক্ষে একটা শাস্তি ছিল।

মা মঞ্জুর বিছানায় বসলেন। মায়ের শাড়ীর চওড়া লালপাড়, গলার বলহার নিয়ে খেলা করতে করতে মঞ্জু বলল,—"মা, একটা গল্প বলো। পূজোর সময়ে কেমন করে দেশের বাড়ী যাব, সেই গল্প।"

সারা বছর কলকাতার ছোট রাস্তা, বদ্ধ বাড়ী, শান, খোয়া, লোহা, ইঁট—এই সবের মধ্যে থেকে থেকে মঞ্জু হাঁপিয়ে উঠত। দেশে ঠাকুরদা থাকেন, অন্য আত্মীয়রাও আছেন। পদ্মাপারের দেশ। মঞ্জুর কবি-মন দেশে যাবার জন্য পাগল হয়ে যেত। কিন্তু বাবার অনেক কাজ, মা গেলে সংসার চলে না। মা ছাড়া মঞ্জুর যাওয়া হয় না। তাই পূজোর ছুটির সামান্য কয়েকটা দিন নিয়ে মঞ্জুর আশা-আনন্দের জাল বোনা চলত। অনেক দূরেব দেশে ট্রেন, ষ্টীমার, নৌকো করে যেতে হ'ত। কি পথের শোভা! নদীর জল, গাছপালা। দেশে পূজো হয়। কত আনন্দ, খাওয়া দাওয়া, দুধ-মাছে ডোবাডুবি। সারা বছর ধরে মঞ্জু দিন গোণে। কবে ওই দিন ক'টা আসবে?

মায়ের কিন্তু গল্প বলা হোল না। একগাদা লোক বাড়ীতে এসে পড়লেন। কুটুম্বরা এসেছেন দেখা করতে। সুতরাং অসুস্থ মেয়েকে ফেলে তাঁদের জলখাবারের ব্যবস্থায় মা ব্যস্ত হলেন।

মঞ্জু আবার একা। গায়ে এখনও জ্বর আছে। একটু আগে জ্বরের কাঠিতে দেখা হয়েছে। তার মানে, স্কুলে যেতে এখনও দেরি। তিন দিন না কাটলে বাবা কিছুতেই যেতে দেবেন না। কি যে বিপদ হ'ল! বছরের প্রথমেই খামোখা জ্বর হ'য়ে পড়ল! নূতন ক্লাসে মেয়েরা নূতন বই কি মজা করে পড়ছে। সে পিছিয়ে থাকবে। আবার চট্ করে মঞ্জুর মনে এল যদি জ্বর বাড়ে? প্রাইজ আসছে। দু'একটা গানটানের মহড়াও দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। হায় ভগবান! মঞ্জু কি শেষে 'প্রাইজ ডে'-তে যেতে পারবে না! মঞ্জুর চোখ ভ'রে জল এল। বিছানার চাদরের কোণটা মুখের মধ্যে পুরে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

লাটাই-ঘুড়ি ঘরের কোণে রাখতে এসেছিল ঝগড়াটে ছোটদা। মঞ্জু চট্ করে চোখ মুছে ফেললো। জানতে পারলে ক্ষেপিয়ে মেরে ফেলবে। "আলোটা জ্বেলে দাও না।" একমিনিটে অন্ধকার, বন্ধ ঘরটা বিজলীর আলোতে আলো হ'য়ে উঠল। ছেলেবেলায় বাড়ীতে ইলেক্ট্রিক ছিল না। বাবা করিয়ে নিয়েছেন। প্রথম প্রথম কি আনন্দ মঞ্জুর! আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ ধাঁধিয়ে ফেলত সে।

ছোড়দা যেন নিজের মনে মঞ্জুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো—"বাবাঃ, আর খেতে পারি না। এ বাড়ীতে খাওয়াটাই বেশী বেশী। সকালে কত রান্নাই হয়েছিল! ধোঁকার ডালনা, বেগুনী, গঙ্গার ইলিশ। বিকেলে অত লুচি,

চপ্ খেলাম। এ বেলা ডিমের কালিয়া, পায়েস হচ্ছে। তাতে রক্ষে নেই। এখন ইয়া রাজভোগ খেতে হ'ল। বাবাঃ! পেটটা যেন জয়ঢাক হ'য়ে গেল।" মঞ্জুর ছোড়দা মঞ্জুকে দেখিয়ে দেখিয়ে পেটে হাত বোলাতে লাগল।

মঞ্জু বেচারীর কয়েকদিন অনাহার চলছে। একটু বার্লি, গ্লুকোজ, তার পথ্য। হাতের পাশে বিছানায় অবশ্য কমলালেবু, বেদানা, তালমিছরির কৌটটা আছে। কিন্তু ওসব খেতে ভাল লাগছে না।

খাবারের বর্ণনায় মঞ্জুর জিবে জল এল। "খুব খেলে তো"? মঞ্জু ছোড়দাকে রাগের সঙ্গে বললো। "কি করবো? গণেশ ঠাকুর ছুটি নিয়ে ভাগ্নের বিয়েতে গেছে। মা নিজে রাঁধছেন কিনা। তা, রান্নাও তেমনি খাসা হয়েছিল। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—বাবা ফিরবার পথে কেক্ কিনে এনেছেন।"

কেক্ জিনিসটার ওপর মঞ্জুর লোভ। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর ঘরে রসগোল্লা-সন্দেশটাই চলে বেশী, কেক্ কমই আসে। চন্দ্রা ব্রাহ্ম, সাহেবী-ভাবাপন্ন পরিবারের মেয়ে। অবস্থাও ভাল। তার বাড়ী থেকে টিফিন আসে। কাঁচের ফুলকাটা প্লেট, শাদা ধব্‌ধবে ঝাড়ুনে ঢাকা। কেক্ থাকে প্রায়ই। শাদা প্লেটে হল্‌দে কেক্ কেমন সুন্দর দেখায়! চন্দ্রা ও তার ছোট বোন নন্দা সরু-সরু আঙুল দিয়ে একটু একটু করে ভেঙে খায়। ওদের সব কিছু কেমন ছিম্‌ছাম্। আমাদের সব কিছু কেমন ভোঁতা, সাধারণ।

ছোটদা যা বলবার বলে বিদায় হ'ল। মা এখনও নীচে। মঞ্জু চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। শরীরটা দুর্বল বোধ হচ্ছে। পেট জ্বালা করছে। কেমন যেন লাগছে? বন্ধ চোখের সামনে ফুটে উঠল একটি বাদামী কাগজের মোড়ক। খুলে গেল মোড়ক, বড় কালচে-বাদামী কেক্—বাদাম-কিস্‌মিস বসানো। প্লাম্ কেক্। আহা, কি স্বাদ! যেন জিবে স্বাদ আপনি আসছে।

কিছুতে ঘুম পাচ্ছে না। যাই নীচে দেখে আসি সবাই চলে গেছে কিনা। শুয়ে আর থাকতে পারি না। আমার অসুখ হলেই এদের স্ফূর্তি বাড়ে। খাওয়া-দাওয়ার ঘটা বাড়ে।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্জু নীচের চাতালে নেমে এলো। টেবিলে রাখা আছে চায়ের পেয়ালা-পিরিচ। টেবিলে চা তৈরী হয়, পাশে একখানা কাঠের চেয়ার। চা খায় সবাই, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ পিঁড়ি টেনে' কেউ সিঁড়িতে বসে'।

নীচে কেউ নেই। চাকরদের ঘরে পুরণো চাকর নবকাকা হুঁকো টানছে। নবকাকাতো বাড়ীরই লোক, মঞ্জুর বাবাকে হাতে করে মানুষ করেছিল। নেপালী চাকর সিং বাহাদুর চায়ের কাপ কলতলায় ধুয়ে ঝাড়ন দিয়ে মুছছে। গণেশ তো ছুটিতেই গেছে। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে চলে যাচ্ছেন। সদর দরজা আর তাদের পড়ার ঘরের

মধ্যে সরু গলিটুকুতে মা মাথায় কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। বাবাও সেখানে।

মঞ্জু চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকল। উনুনে ডিম সেদ্ধ হচ্ছে বটে, কিন্তু পায়েসের তো যোগাড় নেই। ভাঁড়ার ঘরটা দেখা যাক্। না, সে কিছু খাবে না, তার জ্বর হয়েছে কিনা! তবু কেক্‌টা একবার চোখে দেখা যাক্। কেমন কেক্ এবার এসেছে? একরকম কেক্ বাবা আনেন, তাতে বাদাম কিস্‌মিস্ থাকে না, তাকে প্লেন কেক্ বলে। এটা তাই কি? না পেস্‌ট্রি? পেস্‌ট্রি—বিশেষ ভাল লাগে না মঞ্জুর, কেমন তিতকুটে স্বাদ। যাই হোক্, দেখি তো।

ভাঁড়ার তন্ন তন্ন করে খুঁজে মঞ্জু কেকের দেখা পেল না। রাজভোগের ভাঁড়েরও চিহ্ন নেই। শয়তান ছোড়দা তাকে লোভ দেখিয়ে বোকা বানিয়েছে।

নিরাশ মঞ্জু ভাঁড়ার থেকে বার হতেই চোখ পড়ল—চায়ের টেবিলে রাখা পদ্মকাটা কাঁসার রেকাবে এক রেকাব সন্দেশ। অতিথিদের জন্য এসেছিল নিশ্চয়। তখন দু' পয়সার সন্দেশ ছিল মন্দিরের চূড়োর মত দেখতে, গাল-ভরা। বেশ বড় বড়। লোভ সামলাতে পারলো না মঞ্জু, গব্‌গব্ করে গিলতে লাগল। সাত-আটটা খাবার পরে নিরস্ত হ'ল সে। মনে হল—এ কি করছি, অ্যাঁ? আমার না জ্বর! আমি চুরি করে খেলাম! আমি তবে চোর! ছিঃ ছিঃ! মঞ্জুর কাণ গরম হয়ে উঠল। মনে হ'ল পেছন থেকে দু'টো জ্বল্‌জ্বলে

চোখ তার এই পাপ কাজ দেখে ফেলল। কার চোখ? ভগবানের, না শয়তানের? ভয়ে মঞ্জু দৌড়ে দোতালার বিছানায় এসে রোগী সেজে শুয়ে পড়ল চাদর মুড়ি দিয়ে।

বেশ করেছি, খেয়েছি। যখন সন্দেশ নেই দেখে আমার ওপরে তেড়ে আসবে, আমিও চোপা করবো। 'চোপা করবো' কথাটা জ্যাঠতুতো বোন নেবুর কাছে সে শিখেছে। কত খিদে সয়ে থাকবো? কেন খেতে দেবে না? খালি বালি খাও, গ্লুকোজ খাও। খেতে না পেলে কেড়ে খাবো, ছিঁড়ে খাবো।

টুনুর মাসী রাস্তার ওপার থেকে অর্গানে গান ধরেছে— "মন্দিরে মম কে আসিল হে?"—ওদের তেতালা বাড়ীতে সব ঘরে আলো জ্বলছে, লোকজন অনেক। আচ্ছা, টুনুটা পড়ে কখন? সব সময় ওদের বাড়ীতে তো হৈ-হুল্লোড় লেগেই আছে। ওদের বাড়ীখানা কি সুন্দর! নিজেদের বাড়ী। রাস্তার ওপরে ঘরগুলো, এক-একখানা ঘরে তিন-চারটে দরজা, কত জানালা। এমন বাড়ীই মঞ্জুর পছন্দ। তাদের ভাড়া-বাড়ী, কত ছোট! রাস্তার ওপরে একফালি ছাদ থাকলেও ঘরগুলো ভিতরে। গাড়ী-ঘোড়া দেখতে হ'লে একতালার ছাদে যেতে হয়। টুনুর বাড়ী দামী আসবাবপত্রে সাজানো, হাসি-গান সর্বদা। তা হোক, মঞ্জু টুনুর সঙ্গে জায়গা বদলাতে চায় না।

কিন্তু, মঞ্জু কেন সন্দেশ খেল? এত ভালো মঞ্জু। কি হবে? যদি জ্বর বাড়ে? যদি প্রথম পুরস্কার না নেওয়া হয়? যদি সে মরেই যায়? কিছুদিন আগে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়বার

সময়ে পাতলা, সোজা-চুলো মেয়ে সুরমা হঠাৎ টাইফয়েডে মারা গেছে। সুরমা বেশীদিন পড়েনি, বন্ধুও ছিল না। তবু, তার মৃত্যুর খবর পেয়ে মঞ্জু পাঁচ মিনিট অবাক হয়েছিল। ক্লাসের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের সবুজ মাঠের দিকে চেয়ে ভেবেছিল, কোথায় গেল সুরমা? মানুষ মরবার পরে যায় কোথায়?

যদি সন্দেশ খেয়ে মঞ্জুর অসুখ বাড়ে? যদি অমনি ক'রে মঞ্জু মরে যায়? ওমা, কি হবে? তা'হলে সবি যাবে। স্কোয়ারটেবিলের নাইটের কাজ হবে না। বড় লিখিয়ে হওয়া যাবে না। আরতির সঙ্গে ষ্টুডিও খোলা হ'বে না। নদীর ধারে কাঠের ঘরে ষ্টুডিও।

বাবা ঘরে ঢুকলেন। টিনের-ছাউনী কাপড় বদলাবার ঘর থেকে পোষাক ছেড়ে তিনি ধুতি-গেঞ্জি পরে এসেছেন। বাইরের ঘরে লোক এসেছে। বাবা আগে উকীল ছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনে যতীন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে আদালত ছেড়েছেন। এখন তিনি ব্যবসায়ী। প্রাক্তন মুহুরী যতীনবাবু বাবাকে বাইরে ডেকে গেলেন।

নাঃ, কেউ টের পায়নি সন্দেশ খাওয়া। ভালই হ'ল কিন্তু। তক্ষুণি মঞ্জুর মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো, মঞ্জু, ছিঃ! মিথ্যে বলাও যা লুকিয়ে খারাপ কাজ করাও তাই। তুমি না রাজা আর্থারের মত চৌকো-টেবিলের বৈঠক খুলেছ? তুমি না মহৎ হ'বে, ভাল হ'বে?

অত্যন্ত অস্বস্তিতে মঞ্জু ছটফটিয়ে ঠিক করল সে বলবে কাউকে। বাবাকে ? কাল পোষাক-পরা বাবার লম্বা-জোয়ান চেহারা মনে করে ভয় হ'ল তার। খদ্দর ধরলেও মাঝে মাঝে বাবা গরম স্যুট্ পরেন। সম্প্রতি বহুদিন ব্যবসা উপলক্ষে কাশ্মীরে ছিলেন। বাধ্য হয়ে বহু গরম কাপড় করাতে হয়েছিল—ট্রাউজার ছাড়া সেখানে শীত যেত না। সেই পোষাক পরলে বাবাকে আরও বিশিষ্ট দেখাত। ওঃ বাবা, বাবা ভগবানের মত। তাঁকে ভয় হয়। মাকে বলবে মঞ্জু।

একটু বাদেই মা ওপরে এলেন, "মঞ্জু, তোর বার্লি এনেছি। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।"

"মা শোন, আমি খাব না, আমি বোধ হয় মরে' যাব।" মঞ্জু ফুঁপিয়ে উঠল।

"ও কি কথা ?" মা মঞ্জুর বিছানায় বসলেন।

"আমি লুকিয়ে সন্দেশ খেয়েছি।" চুপিচুপি মঞ্জু বলে ফেলল, "কি হবে মা ?"

মা হেসে তার গায়ে-মাথায় হাত দিলেন। বললেন, "কিছু হবে না। জ্বর তো এখন ছেড়ে গেছে দেখছি। ছোট বলেছে তুই সন্দেশ খেয়েছিস।"

তা'হলে, চোখ দুটো ভগবান বা শয়তানের নয়, শয়তানের কাছাকাছি,—শয়তানের বাহন ছোটদার।

"তুমি জানতে, মা ?" আরামে মঞ্জু মাকে জড়িয়ে ধরল।

"মুখে বড় বড় বুলি, কাজে ছেলেমানুষ।" মা মঞ্জুর মাথায়

হাত রাখলেন। কেটে গেল মঞ্জুর আকাশের মেঘরেখা, মিলিয়ে গেল অশ্রু। তারই সঙ্গে কেটে গেল মঞ্জুর জীবনের একটি দিন। পরবর্তী দিনের সুমধুর আভাস ফুটে উঠল কিশোর মনের ঘুমের আকাশে।

এই হাসিকান্নাভরা, আলো-আঁধারী কিশোর দিন। কত মধু এর বক্ষে, মঞ্জু, তুমি জান কি? আজ যাকে বেদনা ভাবছ, সে তো ব্যথা নয়, পুলকেরই রূপান্তর। যখন দীর্ঘ জীবনে ব্যথা আসবে, আঘাত আসবে,—আসবে মঞ্জু, তারা যে পথের বাঁকে বাঁকে শ্বাপদের মত হানা দিয়ে বসে থাকে,—তখন তুমি বুঝবে তোমার কিশোর দিনের অশ্রু তো জল নয়, মুক্তামালা। হাসির মাণিকের সঙ্গে গাঁথা হয়েছে, উৎকর্ষ বিধানের জন্যে, একটি সূত্রে।

এই কিশোর দিন চলে গেলে ফিরে আসে না, কেউ বোঝে কি? মঞ্জু, তুমিও কি বুঝতে পারছ আজ কত ঐশ্বর্য্য তোমার? জীবনের রত্নাগার খুলে ধরা হয়েছে তোমার সামনে নাও, ভোগ কর। চিরস্থায়ী নয় এ কিশোর দিন। আমরা পার হয়ে এসেছি—কৈশোরের স্বপ্নতোরণ পার হয়ে এসেছি জীবনের কঠিন পথে। তাই বারবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছা হয়। তাই, বারবার ফিরে চাই পেছনে-ফেলে-আসা সুমধুর কিশোর দিনের দিকে।

চার

সেই একই দিনে। স্কুলের গাড়ী থেকে আরতি বাড়ীর দোরে নামল। দ্বিতীয় ক্ষেপে ফেরে সে। তাই স্কুলে ছুটির পর একটু বসে থাকতে হয়। তাতে দুঃখ নেই। যাবার সময়ে আটটায় ভাত খেয়ে প্রথম বারের মেয়েদের মত ছুটোছুটি করতে হয় না।

স্কুলের তিনখানা মোটর বাস। টিম্‌টিমে একটা ঘোড়ার বাস আছে বটে, পুরণো গাড়ীগুলোর মধ্যে থেকে বাছাই করে রাখা, কিন্তু আদর কম। কাছাকাছির মেয়ে বা শিক্ষয়িত্রী আসেন তাতে। কেউ ঘোড়ার গাড়ীতে আসতে চায় না। পুরণো লম্বা ফোর্ড গাড়ীখানার আদরও কমে গেছে। সতীশবাবু পুরণো গাড়ী চালিয়ে আমল পান না। নূতন হলুদে-সোনালী আঁজি-কাটা ডজ্‌-গাড়ীর কদর মেয়েরা বেশী করে। চালক নলিনবাবু বড় সন্তুষ্ট তাতে।

আজ আরতির ফিরতে নিয়মিত সময় থেকে খানিকটা দেরি হ'ল। ফোর্ড-গাড়ীতে আসে সে—গাড়ীখানা বিগড়েছে। সতীশবাবু কারখানায় বসে আছেন। অন্য গাড়ীগুলো দিয়ে মেয়েদের পাঠাবার ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় নি। আগেই গাড়ী-গুলো বেরিয়ে গেছে। তাই ঘোড়ার বাসে বারে বারে কাছের মেয়েদের পাঠানো হচ্ছে।

কোচোয়ান মামুদ মহা খুসী। কখনও সে "র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা র‍্যা" শব্দে ঘোড়াকে শাসন করছে, কখনও মেয়েদের শুনিয়ে

শুনিয়ে সহিসকে বলছে, "আমার গাড়ী ভাঙে না, আমার ঘোড়ার কিছু হয় না।—দেখ্ উজবুক।"

বীণাপাণি মণিকাকে বল্লো, "দেখ ভাই, মামুদের আল্হাদ!" নূতন তৃতীয় শ্রেণীতে তিনজন বীণা। দুইজনই আবার বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন বীণাপাণি, অন্যজন শুধু বীণা। তবু গোল মিটত না। তাই বীণাপাণি ব্যানার্জির কথা বলতে সবাই 'নাক-লম্বা বীণা' বলে আগাগোড়া উল্লেখ করত। ওর নাকটা উঁচু ছিল। বীণাপাণির এই ডাকে কোন আপত্তি ছিল না। অন্য বীণা বন্দ্যো। ছোট দেখতে, তাই তাকে সবাই 'ছোট বীণা' ডাকত।

মণিকা বল্ল, "গাড়ী আবার উল্টে না ফেলে!" আরতি রেণু ঘোষকে একটা অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছিল। কাল বাড়ীর কাজে অঙ্কটা দেওয়া আছে। না করে আনলে কৃষ্ণাদির হাতে রক্ষা নেই। রেকারিং ডেসিমেলটা রেণু বুঝতে পারেনি, কৃষ্ণাদির ভয়ে চুপ করে ছিল ক্লাসে। বোঝেনি বলতে সাহস পায়নি।

মণিকার গলা শুনে আরতি চোখ তুলে বল্ল, "ওকি, তুমি এ বাসে যে? তুমি তো গ্রে-ষ্ট্রীটে থাক। অত দূরে ত' ঘোড়া টানতে পারবে না।"

আরতি গাড়ীর পেছনের দিকে ঠেসান দিয়ে বসে রেণুকে অঙ্ক দেখাচ্ছিল। তারপরে ঘুলঘুলি, কোচোয়ানের বসবার আসনের নীচে। হঠাৎ মোটা ভাঙা-গলা শোনা গেল, "খুব টানতে পারবে—মোটর থেকে মেরা ঘোড়া মজবুত আছে।"

মেয়েরা চমকে উঠে গা-টেপাটেপি করতে লাগল। চুল-কাটা চারু, (আগে খোঁপা বাঁধতো, টাইফয়েডের পর চুল কেটে এখন ছোট ছোট কোঁকড়া চুল হয়েছে), চীৎকার করে হেসে উঠে মুখে হাত চাপা দিল। লাজুক মেয়ে ও। বনি (ভাল নাম স্নেহলতা রায়) বললো, "সখ দেখ মামুদের! মিসেস নাগ শুনলে বকুনী দেবেন। কিন্তু, তুমি এলে কেন, মণিকা?"

মণিকা হাত মুখ ঘুরিয়ে বল্ল, "পালিয়ে এসেছি। চোঁ-চাঁ। মিসেস নাগ যেই একটু ওধারে সরেছেন, আমিও চট করে লুকিয়ে গাড়ীর গর্তে অন্ধকারে বসেছি। ভাগ্যিস বুড়ি দেখেনি! মোটার বাসের থার্ড ট্রিপে যাবো। এতক্ষণ হা-পিত্যেশ স্কুলে বসে ভেরেণ্ডা না ভেজে একটু বেড়িয়ে আসব বলে এলাম। ঘোড়ার গাড়ী তো দূরে যাবে না। ঠিক সময়ে ফিরব'খুনি।"

চতুর্থ শ্রেণীর মণীষা বল্ল, "যদি ঠিক সময়ে ফিরতে না পার? যদি ফিরে দেখ তোমায় ফেলে তোমার বাস চলে গেছে? কি করবে তা'হলে?"

যাতায়াতের ব্যবস্থার পাত্রী মিসেস্ নাগের রুষ্ট মূর্তি মনে পড়ে মণিকার মুখ শুকিয়ে গেল।

আরতি সান্ত্বনা দিয়ে বল্ল, "না, তুমি ঠিক ফিরতে পারবে।"

আবার ভাঙা মোটা-গলা শোনা গেল, "কুছ্ ডর নেই। হামি আপনাকে লিয়ে যাব।"

মলিনা বল্ল, "দেখছ—এর মানে আমাদের সব কথা শুনছে মামুদ।"

পুরাতন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী অংশুদি গাড়ীর মুখের কাছে এক গাদা বই-খাতা কোলে নিয়ে বসেছিলেন। গাড়ীর দরজার দুই দিকের দুই আসন সম্মানের। শিক্ষয়িত্রী বা উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রী বসে। এ একটা আপনা থেকে মেনে নেওয়া নিয়ম। লম্বা গলার ওপরে পদ্মের মত মুখখানা ফিরিয়ে অংশুদি আদেশ দিলেন, "কথাবার্তা বন্ধ করে সবাই বসে থাক, তা'হলেই ও জব্দ হবে।"

অংশুদির মুখের ওপর কেউ 'না' বলতে ভরসা না পেলেও চাপা কথার স্রোত বন্ধ হ'ল না। এমন সময়ে একখানা চলন্ত লরি-গাড়ীর শব্দে ভয় পেয়ে মামুদের অতি সাধের উচ্চৈশ্রবা লাফিয়ে উঠলো তড়াক করে। সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড! কারুর মাথা ঠুকে গেল, কেউ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কেউ বা হাসতে লাগল। সকলে মামুদকে ধমক দিল "বক্‌বকানি আর পরের কথা শোনা ছেড়ে গাড়ী ভাল করে চালাও না।"

মণিকা কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্ল, "কেন শুধুশুধি এলাম ভাই, মরতে? আজ আবার বিষ্যুৎবারের বারবেলা। ওই বুঝি আবার ঘোড়া লাফায়! ও মামুদ, জোরে লাগাম টেনে ধর না।"

নাক-লম্বা বীণা বল্ল, "কেবল মুখেই র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা!"

দ্বিতীয় শ্রেণীর শৈল মণিকাকে বল্লো, "তোমার জন্যে এই হয়েছে। বেপাড়ার মেয়ে তুমি, এ বাসে এলে কেন?"

শৈলের ঈষৎ নাকী-সুরকে ভেংচিয়ে মণিকা বল্ল, "সঁবাইকে পঁটলডাঙায় নিয়ে যাঁব বলে এঁসেছি।"

অনিলা শৈলর বন্ধু, সে চটে গেল,—"তার মানে তুমি আমাদের মরতে বল? পটল তুলব আমরা?"

শৈল গালে হাত দিয়ে অবাক হ'ল—"ওমা, কি অদ্ভুত!"

এই স্কুলের একটা বিশেষ গালি ছিল, 'অদ্ভুত'। কথাটি আদৌ গালির নয়, কিন্তু মেয়েরা গাল হিসাবে ক্রমাগত ব্যবহার করে যেত। যথা: 'ভারী অদ্ভুত মেয়ে তুমি,' 'কি অদ্ভুত মেয়ে', 'যাও অদ্ভুত মেয়ে, কথা বলব না', ইত্যাদি। কথাটা শুনিয়ে যে বলতো সে ভারী একটা জোরালো গাল দেওয়া হ'ল ভেবে খুসী হ'ত, যে শুনতো তার মনটা বিষিয়ে যেত।

কথার মোড় ঝগড়ার দিকে ফিরছে দেখে আরতি তাড়াতাড়ি বল্ল, "না, না, পটল তুলব কেন? মামুদ যেন কেমন করছে! কোনদিন এত খারাপ গাড়ী তো ও চালায় না।" আবার দোষটা মামুদের ঘাড়ে পড়ল। সবাই বেচারীর মুণ্ডপাত করতে লাগল।

গাল-মন্দ শুনে মামুদের মাথা গরম হ'য়ে গেল। ঘোড়াটা খানিক ক্ষণ শান্তভাবে দৌড়ে আবার সমানে লাফাচ্ছে, এদিক-ওদিক যাবার চেষ্টা করছে। ঝপ্ করে মামুদ কোচবাক্স থেকে নেমে পড়ল চাবুক হাতে। "তবে রে!"—সপাৎ সপাৎ মামুদের চাবুক পড়তে লাগল রোগা ঘোড়ার হাড়-সার শরীরে। মারের চোটে ঘোড়াটা ছট্ফট্ করতে লাগল। সহিস মুখের লাগাম ধরে রেখেছে, ছুটে পালানো সম্ভব হ'ল না। একটি দুটি লোক জমা হ'তে আরম্ভ

করল। কেউ নিষেধ করল, কেউবা 'আরও মার' বলে উৎসাহ দিল।

মেয়েদের এমন মার দেখা অভ্যাস ছিল মাঝে মাঝে। আগে সব গাড়ী ছিল ঘোড়া-টানা। . বজ্জাত ঘোড়ারা মার খেত। বিশেষ করে মামুদ বড় কড়া কোচোয়ান। তার হাতে পড়ত বজ্জাত ঘোড়াগুলো। স্কুলের সামনে ঘোড়াকে অমানুষিক মার দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষয়িত্রীরা দেখে কিছু না ব'লে চলে যেতেন। এ দৃশ্য মেয়েদের গা-সওয়া ছিল। তবু অনেকদিন পরে ঘোড়াকে মার দেওয়া দেখে মেয়েরা প্রতিবাদ করল। কিন্তু মামুদ তখন ক্ষেপে গেছে। গায়ের জোরে মারা চাবুকে ঘোড়াটা থর থর করে কেঁপে উঠছে।

গাড়ীর দরজা খুলে হঠাৎ পথের মধ্যে আরতি নেমে এসে মামুদের সামনে দাঁড়াল,—"মামুদ শোন, ঘোড়াকে আর মেরো না। এক্ষুণি মার বন্ধ কর।"

মামুদ রুখে একটা কি বলতে যেয়ে আরতির দিকে চেয়ে থেমে গেল। হাতের চাবুক তার হাতেই রইল। আরতির মুখে কি যেন একটা ছিল।

রাস্তার লোকেরা এক এক করে সরে যেতে লাগল। আরতি ছোট মেয়ে নয়, তার ওপর যথেষ্ট লম্বা-চওড়া। একেবারে পথে নেমে এসেছে। মামুদ বিড়্ বিড়্ করতে করতে মাথা নামিয়ে কোচ-বাক্সে উঠে বসল। আরতি গাড়ীতে ফিরে আসলে অংশুদি বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "অত

লোকের মধ্যে রাস্তায় তুমি নেমে গেলে কেন? মিস্ বাসু ভীষণ বকবেন শুনলে। আমিই তো নিষেধ করলাম। ও থামত ঠিক।"

আরতি উত্তর দিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। কেন যে অসহায় জীবকে মানুষ এমন করে মারে? ওরা তো কথা বলতে পারে না। চীৎকার করে নালিশ জানাতে পারে না। ঘোড়াটার কি কষ্ট! মোটর গাড়ী হ'বার পরে ওর আদর নেই। বোর্ডিংয়ের পেছনে আস্তাবলে পড়ে থাকে। ভাল করে খেতে দেয় না। কেউ যত্ন করে না। মিস্ বাসুর চোখ সব দিকে, কিন্তু ঘোড়াকে মারা তিনি বন্ধ করতে পারেন না? ঘোড়াটাকে আরতি বড্ড ভালবাসে। ঘোড়াটার একখানা ছবি এঁকেছে আরতি। কেন যে মানুষ নিরীহ জন্তুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে? আরতির বাড়ী ঘোষের লেনে, আশেপাশে লোহার দোকান। মেয়েরা ঠাট্টা করে তাকে 'লোহাপটীর মেয়ে' বলে ডাকে। সেই লোহা-বোঝাই গাড়ী টানবার সময়ে গরু-মোষের উপর কি অকথ্য অত্যাচার চলে আরতি তা দেখেছে। বোঝার ভারে গরু মোষ নুয়ে পড়েছে, এক-পা চলবার সাধ্য নেই। চাবুকের চোটে নিদারুণ রোদে সেই বোঝা টানিয়ে মাইলের পর মাইল চালাচ্ছে। জল-ঝড়ে মাথায় ছাউনির ব্যবস্থা নেই। পেট ভ'রে খেতেও দেয় না। যখন বুড়ো বয়সে অশক্ত হয়ে পড়ে কসাইয়ের হাতে বিক্রী করে দেয়। ওঃ, জগতে

কত অন্যায় হচ্ছে! এ সবের প্রতিবাদ, প্রতিকার, তারা করবে। মঞ্জু 'চৌকো টেবিলের বীর সভা' খুলে ভাল কাজ করেছে। আরতি নাইটের উপযুক্ত হবে।

আরতি কিন্তু নিজে জানল না যে সে আজ নাইটের প্রথম কাজ করেছে।

আরতি বাড়ীতে নামল। গলির মধ্যে ছোট বাড়ী। বিজলী নেই। সন্ধ্যা লেগে গেছে। আরতির মা একখানা বড় গামছা পরে হাত মুখ ধুচ্ছিলেন, রান্নাঘরে যাবেন ব'লে। শুচিবায়ু আছে তাঁর। লণ্ঠন হাতে দোর খুলে দিয়ে বল্লেন, "ওমা খুকী, এত দেরি হ'ল কেন? বুড়ীও নেই, ভেবে মরি!"

বুড়ি আরতির মেজদি। ওই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। সম্প্রতি বিবাহিতা বড়দির বাড়ী দিন দুই আছে। তাই আরতি একা স্কুলে যাচ্ছে।

রাস্তার ওপরে একতালার ঘরে আরতিরা দুই বোন পড়ে। ভাই নেই। বাবা একটা অফিসে কাজ করে। আরতিদের ঘর খুব গুছোনো। লোহার খাটের বিছানা, পড়ার টেবিল, কালো কুচ্‌কুচে অয়েলক্লথে ঢাকা। অনেক বই—মৌচাক, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, সন্দেশ,—বাঁধানো। আরতির মা বই পড়তে ভালবাসেন।

"খুকি, রান্নাঘরে ঠাঁই করে দিচ্ছি। জলখাবার খেয়ে যা।" মা রান্নাঘরে চলে গেলেন। মেঝেতে পিঁড়ি পেতে মা কাঁসিতে

লুচি তরকারি গুছিয়ে দিলেন। পাশে একটা বাটিতে মিহিদানা, দরবেশ। খাবারওয়ালা বাক্সে করে রোজ দিয়ে যায়। মিষ্টিই রোজ রাখেন মা। আরতি সুবোধ বালিকা, খাওয়া-পরা মায়ের কথাতেই চলে। মা বড়ঘরের মেয়ে ছিলেন। ছোট ভাড়া-বাড়ী তাঁর নানা সখের জিনিসে ভর্তি। তিনি ঠাকুর-চাকর রাখেন না। সংসারের কাজ একা হাতে করে যান, মেয়েদের কাজও ছোট শিশুর মত করে দেন। সকলে এতে অভ্যস্ত। আরতির কখনও মনে হয় না সংসারের কাজ হাতে হাতে কিছু ক'রে মায়ের পরিশ্রমের লাঘব করা উচিত।

আরতি উঁচু পিড়িতে খেতে বসল। তারা দিনে একবার মাত্র চা খায়, সকাল বেলায়। কাঁসার বড় বাটীতে একবাটি পাত্‌লা দুধ মা পাতের কাছে এনে রাখলেন ও খাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করতে লাগলেন। তিনি মেয়েদের বেশী করে দুধ খাওয়াবার ভক্ত। "এত দুধ আমি লুচির সঙ্গে খেতে পারব না। তা'হলে লুচি তুলে নাও।" বিস্তর কথা-কাটাকাটির পরে রফা হ'ল অর্ধেক দুধ আরতি রাত্রে ভাতের পাতে খাবে। মা মেয়ের স্কুলের জলখাবারেরর বাক্স ধুতে যেয়ে বলে উঠলেন, "এটা আবার কার, বাছা? দুটো বাক্স কেন?"

আরতির টিফিনের কালো কৌটোটা আগে বিলিতী সাবানের বাক্স ছিল। নিজের কৌটোর সঙ্গে একটি শাদা ঝক্‌ঝকে

এ্যালুমিনিয়ামের টিফিন-বাক্স সে বয়ে এনেছে। "এটা মা, মলিনা স্কুলে ফেলে গেছে। ওখানে রেখে এলে হয়তো চুরি হয়ে যাবে, তাই আনলাম বাড়ীতে। কাল ফেরৎ দেবো।" "তা'হলে এতে খাবার দিয়ে দেব। কাল বেচারী বাক্সের অভাবে টিফিন তো আনতে পারবে না।" "সে বেশ হ'বে মা। তুমি যেমন চিংড়ি মাছের তরকারি আমাকে মাঝে মাঝে দাও, তাই করে দিও। ওরা খুব ভালবাসে। তোমার রান্না মঞ্জু বড় পছন্দ করে।"

"ওরা জানল কেমন করে?"

"অনেক দিন যে আমরা একসঙ্গে মিলিয়ে টিফিন খাই।"

"খুকী, মঞ্জু আসেনি আজ? চন্দ্রার বৌদি কেমন হ'ল?"

"মঞ্জুর জ্বর সারেনি এখনও। চন্দ্রার খুড়তুতো বোন বল্লে, বৌদি সুন্দর হয়েছেন।"

"একদিন ওদের সব আসতে বলিস। আমার দেখতে ইচ্ছে করে।" মা বল্লেন।

কৌটো ধুতে ধুতে মা বলে উঠলেন, "ওমা, মলিনার বাক্সতে কেমন ছোট একটা কাঁসার বাটি?"

"ওতে মলিনা নলেন গুড় আনে, লুচি দিয়ে খায়।"

"বলিহারি বুদ্ধি! তা বাটিতে এমনি বসানো থাকে?— উল্টে পড়ে না?"

"ও যে খুব শান্ত, মা। চুপচাপ্ নিজের মনে থাকে, কি যেন ভাবে!"

"সে তো ভাল কথাই, বাপু। তোমাদের মত হাতে-পায়ে লক্ষ্মী না হওয়াই ভাল।"

অফিস থেকে বাবা ফিরেছেন দেখে মা পাথরের বাটিতে বেলের পানা ছাঁকতে বসলেন। আরতির কোন কাজ নেই। যা করবার সমস্ত মা-ই করে নেবেন। ছেলেবেলা থেকে সে জেনে এসেছে মা সবল-শক্ত, সে-ই ঘরের কাজে অক্ষম-দুর্বল। বাইরের কাজ পারলেও, ঘরের কোন কাজ পারে না সে—কেমন এলিয়ে পড়ে। মেয়েলী কিছু নেই তার মধ্যে। সাজ সে করতে জানে না, ভালও বাসে না। শাদা মিলের শাড়ী, লম্বা-হাতা জামা সে চিরকাল পরে। মা তাঁতিনী ডেকে কত রঙীন শাড়ী কিনে রাখেন। সে সব তোরঙ্গে পচছে। আরতির সোজা চুল, নেই বল্লেই হয়; নাক, মুখ কাটা-কাটা ক্ষোদাই কাজের মত। ফর্সা রঙে, শাদা জামা-কাপড়ে, লম্বা দোহারা গড়নে আরতিকে একটু আলাদা লাগত। ক'টী বোন লোহাপটীতে নিজেদের লেখাপড়া নিয়ে থাকত। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যাতায়াত ছিল না, এক দিদি-জামাইবাবু ছাড়া। অন্য আত্মীয় সবাই গোঁড়া, অল্পশিক্ষিত। মিশ খেত না।

আরতি দোতলায় চলে এল। বাক্স খুলে পিতলের বাঁশীটা নিয়ে ছাদে উঠে গেল। চার পাশে বস্তী, একতালার ছাদের মধ্যে তাদের দোতালা বেশ উঁচু, তাই নিরিবিলি। রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলো মই-ঘাড়ে আলোদার জ্বেলে দিচ্ছে।

আরতি আলসের ধারে বসল। বাঁশীটা কাপড়ে মুছে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলো পূরবীর সুর—

"দিবা অবসান হ'ল,
কি কর বসিয়া মন ?"—

সকলে বলে বাঁশী বাজালে বুক খারাপ হয়। তা, আরতির স্বাস্থ্য ভাল। ভয় নেই তার। এস্রাজ মা সখ করে কিনে দিয়েছেন। এক বুড়ো ভদ্রলোক এসে কদাচিৎ একটু শিখিয়ে যান বিনে পয়সায়। মঞ্জু ভাল এস্রাজ বাজায়। স্কুলের কনসার্টে সে থাকে। তবে মঞ্জু গানের স্কুলে বাজনা শেখে। আরতির পক্ষে সম্ভব নয়। গানের গলা নেই আরতির, তাই একটু বাজনার চর্চা রাখে সে।

সুরটা বাজানো শেষ হ'লে আরতি উঠে ছাদে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মেজদি নেই। বাড়ীটা খালি-খালি লাগছে। তবে মেজদি পরশু দিন চলে আসবে। দিদি এখন ভাল আছেন। মেজদি আসবার সময়ে দিদির বড় মেয়ে ডলি আসবে সঙ্গে। ডলিকে বড় ভাল লাগে। বয়সে একটু ছোট হ'লেও ডলি তার বন্ধু।

আকাশে তারা ফুটে উঠল। বড় হ'য়ে কি হবে আরতি ? বিয়ে সে ভাবতে পারে না। আচ্ছা, মঞ্জু যা বলে সে তো ভাল। ষ্টুডিও করবে তারা। মঞ্জুকে সে তো কথা দিয়েছে।

ষ্টুডিও পরের কথা। আপাততঃ পড়াশোনার সময় হয়েছে। পড়তে যাওয়া যাক। কাল অনেক পড়া আছে।

একতলার ঘরে এল আরতি। মা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে টেবিলে রেখে গেছেন। আলোটা বাড়িয়ে চেয়ারে সে বসল। রুটীন খুলে দেখে নিল। কাল বাংলা কবিতা মুখস্থ আছে। আগেই করে রেখেছে সে। তবু ঝালিয়ে নিতে হবে। বই খুলে ঝুঁকে আরতি জোরে পড়ে' মুখস্থ করতে লাগল—

"আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে"—

পাঁচ

গরমের ছুটির দিন আজ। সবচেয়ে লম্বা ছুটি ব'লে এ-দিনে প্রায় সমস্ত ক্লাসের মেয়েরাই কিছু উৎসব আনন্দ করে। ডাল-পালা দিয়ে ক্লাস-রুম সাজানো, (মিস্ বাসুর বিশেষ অনুমতি নিতে হয়), খাবার কিনে খাওয়া, টিচারদের খাওয়ানো, অভিনয় করা ইত্যাদি মেয়েরা মিলেমিশে করত। এ বছর তৃতীয় শ্রেণীর মেয়েরা অভিনয় করছে—অন্য ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরা দেখতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। হলে দরোয়ানদের সাহায্যে চেয়ার ও বেঞ্চ আনা হয়েছে। বেয়ারাদের দিয়ে মেয়েরা ষ্টেজে, পরদা, সীন খাটিয়ে নিয়েছে। পালা হচ্ছে সুকুমার রায়ের লেখা নাটক—'অদ্ভুত রামায়ণ'।

রাক্ষস-বানরের যুদ্ধ নিয়ে লেখা হাসির বই। মঞ্জু সেজেছে

সুগ্রীব রাজা, মণিকা হনুমান, নিনি বলে একটি নতুন মেয়ে রাবণ, চিত্রা ভগ্নদূত, আরতি বালি, নন্দিনী বিভীষণ—এই রকম।

এরা সকলে অভিনয়ে বেশ দক্ষ, চর্চাও রাখে। মাঝে মাঝে ছুটির ঘণ্টায় নিজেদের মধ্যে অভিনয় করে—কখন হাসির, কখন গম্ভীর। এক্ষেত্রেও মঞ্জু, আরতি অগ্রণী। তবে অল্প-বিস্তর সবাই অভিনয় পারে। এবারে প্রায় সবাই নামছে। যারা ভাল অভিনয় করে, তারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

রাক্ষস ও বানরের পোষাক কেমন হবে এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলার পর মঞ্জু ঠিক করেছিল বানরের পোষাক খুব ভদ্র হোক, ভাল ধুতি-পাঞ্জাবীতে বাবুর সাজ। কেবল একটি লম্বা লেজ লাগানো হোক তাহলেই চূড়ান্ত মজা হবে। সাজ-ঘরে সারি সারি মেয়েরা ধুতি পাঞ্জাবী পরে' ল্যাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ল্যাজেরও পাহাড় করে' রাখা হয়েছে। চাদর, কাপড়, দড়ি, সমস্ত পাকিয়ে পাকিয়ে, কৌশলে ল্যাজ বানানো হয়েছে। এখন কেবল লাগাবার অপেক্ষা। সকলে মনোমত ল্যাজ বেছে বেছে আলাদা করে' রাখছে। কেউ বা বে-হাত হবার ভয়ে হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

মঞ্জু বেশ সেজেছে। বড়দা লম্বা-চওড়া নয়। তাঁর হাতে-পায়ে ধরে' সিল্কের পাঞ্জাবী চেয়ে এনে পরেছে। মা সখ করে' বাবার জন্যে টাঙ্গাইল থেকে জরির ধুতি চাদর আনিয়েছিলেন। সে সব এখন মঞ্জুর অঙ্গে। মাথার চুল বাব্‌রি আকারে

কোঁচ্‌কানো। চোখে নিজের সোনার চশমা জোড়া। চলা-ফেরায় অসুবিধা হবে ব'লে ল্যাজটা শুধু লাগানো হয়নি। বানর রাজার উপযুক্ত তিনহাত লম্বা সিল্কের ল্যাজ তৈরী আছে। ষ্টেজে নামবার আগে সে পরে নেবে। এর ওপর মঞ্জুর সখ ছিল একটা সিগারেট মুখে রেখে টানার ভাণ করা। তা'হলে আরও মজা হোতো। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের ভয়ে সে সাহস হয়নি। এখন পেন্সিল মুখে মেয়েদের সামনে দেখানো হচ্ছে সেটা।

গন্ধমাদন পর্বত হয়েছে এক বোঝা পাহাড়, মেটে আলোয়ানে জড়ানো। নন্দিনী, গৌরী তাতে আগাছা উপড়ে এনে লাগিয়ে দিচ্ছে। মিনতিও বানর সেজে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে পেণ্টার অথবা সজ্জাকার মলিনার কাছে যেয়ে শাসাচ্ছে, "এই আমার গোঁফটা ভাল করে এঁকে দে না, নইলে ঠ্যালা বুঝবি।"

এধারে ল্যাজ নিয়ে গোলমাল বেঁধে গেল। এর ল্যাজটি ভাল দেখে ও হাতাতে চায়। হনুমানের জন্য সবুজ কালো ডোরাকাটা একটি বিশাল ল্যাজ করা হয়েছিল। হনুমান সেটি ঘুরে ফিরে দেখে দেখে যাচ্ছিল। সেই লোভনীয় ল্যাজটি বানর-বেশী নীলিমা পরে ফেলেছে। খুলতে রাজী হচ্ছে না সে।

"না ভাই, এ ল্যাজ আমার খুলে দাও।" মণিকার কাকুতি-মিনতিতে নীলিমা দুষ্টু হাসি হাসল,—"আরে দাদা, অন্য ল্যাজ পরগে যাও। ল্যাজের অভাব কি?"

ল্যাজ হারিয়ে মণিকা মধ্যস্থ মানল অন্য মেয়েদের।

আরতি বল্ল, "না ভাই, ওটা ওর ল্যাজ। ওর জন্যে বানানো হয়েছে বিশেষ করে। আমি তোমাকে অন্য ল্যাজ দেখে দিচ্ছি।" গৌরী বল্লে, "হনুমানের ল্যাজ তো তোমার চেয়ে বেশী ইম্পর্টেণ্ট।" হনুমান অবশেষে আদি ও অকৃত্রিম ল্যাজ ফিরে পেল।

"বলি, এদিকে তোমরা ল্যাজ ল্যাজ করে মরছ, ওদিকে যে সবাই এসে বসেছে। এখন আরম্ভ করতে হবে না?" মিনতি বলে উঠল।

"জ্যোৎস্না, আমার ল্যাজটা লাগিয়ে দাও"—সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল। শাদা করে শাড়ী পরা জ্যোৎস্না রায় সেপটিপিন্ হাতে বসেছিল। উষা সেন ওরফে বুলু ছিল ল্যাজের তদারকে। ল্যাজ লাগানো সুরু হয়ে গেল।

আরতি তাড়াতাড়ি বাঁশী হাতে দাঁড়াল। গানে বাঁশী বাজানো তার কাজ। চন্দ্রা ভাল নাচতে পারত। বন্ধুদের মতে সে প্যাভ্‌লোভার চেয়েও ভাল নাচিয়ে, যদিও প্যাভ্‌লোভার নাচ দেখবার সৌভাগ্য চন্দ্রা, গৌরী দু'জন ছাড়া কারও হয়নি। গানের সঙ্গে শুধু নাচ কেন? ভাল আবৃত্তির সঙ্গেও নাচা যায়, এ তথ্য মঞ্জু আবিষ্কার করেছে। তখনও ঠাকুর বাড়ীর চাল চলেনি। আজ মঞ্জুর আবিষ্কারের পরীক্ষা। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি মঞ্জু নানাভাবে আবৃত্তি করে নিজে দেখিয়ে চন্দ্রাকে নাচ শিখিয়ে দিয়েছে। নির্ঝর গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। বেঞ্চ, চেয়ার কাপড় দিয়ে ঢেকে গাছের টাব্ বসিয়ে

গুহা করা হয়েছে। শাদা শাড়ী, জরি মোড়া বেণী, চন্দ্রা শুয়ে আছে, ঘুমন্ত নির্ঝর! টর্চের আলো পড়ল, 'রবির কর' আর কি! সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রা ঘুঙুরের শব্দে উঠে বসল। একটা কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে বানর-রূপী মঞ্জু পোষাক ঢেকে মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে লাগল। তার শিক্ষামাফিক্ নানা ভাবে নাচটি চন্দ্রা অতি চমৎকার ভঙ্গীতে শেষ করল। হাততালির শব্দে ঘর ফেটে যেতে লাগল।

মূল অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল। পর্দা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কালিঝুলি মাখা বানরেরা সুসজ্জিত বেশে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা ল্যাজের ডগা কোঁচার মত হাতে নিয়ে। দর্শকেরা হেসে গড়িয়ে পড়ল, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েরা। তাদের হাসি আর থামেই না।

রিহার্সেল জোর হয়নি বলে সময় সময় ভুল হ'তে লাগল। সেরে নিয়ে কাজ চল্‌ল। একবার হনুমান-সুগ্রীবের এক সঙ্গের দৃশ্যে পর্দা উঠে যাবার পরে সুগ্রীব দু'একটা কথা বলে দেখে হনুমান ষ্টেজে নাই। কি জানি কেন সে ভেবেছে তার পার্ট শেষ হয়ে গেছে, ল্যাজ ধরে সে ভেতরে চলে গেছে নির্বিবাদে।

সুগ্রীবের মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। আর কারুর এ দৃশ্যে ভূমিকা নেই। এখন কি করা যায়? একা একা ছুটো কথা বলে পর্দা ফেলে দেওয়া চলে না। অগত্যা সে 'হনু', 'ও হনু' ডাকতে ডাকতে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগল। আর

ঘন ঘন উইংসের দিকে চাইতে লাগল। কিন্তু কোন ফল হোল না। হনু ওরফে মণিকা কাছে পিঠে কোথাও নেই। সাজ ঘরে সে তখন চা খেতে বসেছে।

মঞ্জু মহা বিপদে পড়ল। ঘর ভর্তি গোটা স্কুলের মেয়ে ও শিক্ষয়িত্রী, তার দিকে চেয়ে সকলে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল। সে বানিয়ে বানিয়ে বল্ল, "নাঃ, ব্যাটাকে নিয়ে পারা যায় না। যাই ডেকে আনি।" বেরিয়ে যেয়ে সে চাপা গলায় হনুকে ধমকাতে ধমকাতে টেনে নিয়ে এল। অভিনয়ের অঙ্গ এটা ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে রইল।

আর একবার। গন্ধমাদন নিয়ে হনুমান এসে পড়েছে ভগ্নদূতের গায়ে। গোলমালে ভগ্নদূত ভেবেছে একা বুঝি তার মূর্ছা যাবার সীন,—সেটাই হনু বুঝিয়ে দিচ্ছে। সে অমনি লম্বা কথার মধ্যে তাড়াতাড়ি কথা বন্ধ দিয়ে, হাত মুঠো পাকিয়ে, চোখ বুজে কাঠের মতো ষ্টেজে ধপ্ করে পড়ে মূর্ছা গেল। হৈ-হৈ হওয়াতে সে দৃশ্যে বাধ্য হয়ে যবনিকা ফেলতে হোল।

রাবণ-সুগ্রীবের যুদ্ধ। রাবণের হাতে বিরাট গদা, সাজ-পোষাকও তেমনি। সে কেবলই চোখ ঘোরাচ্ছে, আর গদার বাড়ি মারছে শূন্যে। মেয়েরা দেখে ভারী হাসতে লাগল। মঞ্জুরও ভারী হাসি পেল অথচ তার রাবণের সঙ্গে কথা আছে হাসির ধমকে সে তা' বলতে পারছে না। ক্রমাগত সে রাবণকে ইসারা করতে লাগল। কথা বলবার সুযোগ

দিতে, কিন্তু রাবণ কিছুতেই শুনল না। অগত্যা ঐ অবস্থায় মঞ্জু পার্ট বলতে গেল, কিন্তু হেসে ফেলতে লাগল। বিশ্রী. জিনিষ। একবার ধরলে রক্ষা নেই। মঞ্জু অগত্যা রাবণকে কোনমতে জনান্তিকে বলতে গেল, "এই এ্যাকটিং করতে দেনা আমাকে।" কথাটা কিন্তু জোরে হয়ে গেল। দর্শকেরা সবাই শুনতে পেয়ে খুব হাসতে লাগল। যাক্, উদ্দেশ। এভাবেও সে উদ্দেশ সফল হ'ল।

অভিনয় মোটের উপর ভালই হোল। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীরা বহু প্রশংসা পেল। এবার শেষ গান ছ'সাত জন মিলে গাইছে,—

—"বাদল ধারা হ'ল সারা, বাজে বিদায় সুর,
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর—"

গাইতে গাইতে মঞ্জুর মনে হ'ল সে যেন অনেক দূর চলে যাচ্ছে। এই স্কুল, এই বন্ধুরা, তাকে ধরে রাখতে পারছে না। একলা পথে সে চলেছে—কঠিন পথ। লক্ষ্যে পৌঁছুতে কিন্তু হবেই তাকে। বিদায় সুর, তারই বিদায়ের সুর। আপনা থেকে মঞ্জুর চোখে জল এল। আরতি কোথায়? বন্ধুরা কোথায়? সকলে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে জেগে থাকার ব্রত কি তার একার?

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। রোগা, কালো মঞ্জু ফিরে এল তার স্কুলে। অবাক হয়ে সে ভাবল, কেন যে সময়ে সময়ে তার এমন হয়!

ছয়

গরমের ছুটী চলেছে। দুই চারজন ভাগ্যবতী পাহাড়ের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা হতে গেছে। বাকীরা কলকাতার নিদারুণ গরমে দুপুর বেলায় পাখা, বিকালবেলা পাঞ্জাবরফ খেয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে। শিক্ষয়িত্রীরা অনেক বাড়ীর কাজ দিয়েছেন। স্কুল খুললে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার ভয় বা শিক্ষয়িত্রীর রক্তচক্ষুর ভয়ে কিছুতেই মেয়েরা মন দিয়ে পড়াশুনা করতে পারছে না। কেউ কেউ অবশ্য মরি-বাঁচি করে আদা-জল খেয়ে পড়তে লেগেছে। কিন্তু, সে কথা কেউ স্বীকার করত না কেবল আরতি ছাড়া। সে পড়াশোনায় ভাল ছিল, পড়তও বেশী। মঞ্জু পড়াশোনা কিছুই করত না। মাথা ভাল ছিল, একটু পড়লেই হয়ে যেত। ক্লাসে তখন মঞ্জুর অনুকরণ স্বতঃসিদ্ধ সত্য ছিল। সকলেই তাই বোধ হয় না পড়ার ভাণটা বাইরে দেখাত। কিন্তু অত কম পড়াতে কারুর হোত না। প্রাণপণে ভেতরে ভেতরে সকলেই তাই পড়ে যেত। এই কথা ধরা পড়লে কিন্তু যেন ভয়ানক একটা লজ্জা হোত।

অনেক মেয়ের বাড়ী কাছাকাছি থাকলেও যাতায়াত হরদম ছিল না। তবু লম্বা ছুটিতে মাঝে মাঝে এ-ওর বাড়ী এক আধদিন যেত। কিন্তু, বড় বড় চিঠি লিখত তারা পরস্পরের কাছে সব খবর দিয়ে, শুধু নিজেদের প্রাণপণে পড়ার খবরটি গোপন রেখে।

ছুটিতে চন্দ্রা দার্জিলিং গেছে। নন্দিনী গেছে মামার বাড়ী

বরিশালে আম খেতে। বীণা গুহও কলকাতায় নেই। মেয়েটি অল্প দিন ভর্তি হয়েছে। সুন্দর চোখ দুটি, কোঁকড়ান চুল, টুকটুকে লাল গাল আপেলের মত। তাকে নিয়ে একদিন আরতির বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল মঞ্জুর। কিন্তু বীণা চিঠিতে জানাল যে, সে কলকাতায় নেই, দেশের বাড়ী ছুটিটা কাটাতে গেছে। তা'হলে একদিন আমিই যাই, নইলে আরতি কি ভাববে? মঞ্জু চিন্তা করল। বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট থেকে ঘোষের লেন কিছুমাত্র দূরে নয়। তবু তোড়জোড় কত! আরতিকে চিঠি লেখা হ'ল, মাকে বলে বাবার অনুমতি নেওয়া হ'ল।

কয়েকদিন আগে মঞ্জুর বাবা পুরী গিয়েছিলেন। অনেক জিনিষপত্র নিয়ে ফিরেছেন। বাইরে গেলে তাঁর নানা রকম জিনিস কিনে আনা অভ্যাস ছিল। ছুটির দিন। সকাল দশটায় খেয়ে স্কুলের পড়াশোনা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েনি মঞ্জু। বেড়াতে যাওয়া ঘটে না, তা আবার একটু দূরের বন্ধুর বাড়ী। খুব একটা উৎসাহ আনন্দ নিয়ে মঞ্জু সাজগোজ করল। বাবা একখানা নীলরঙের শাদা ফুল-তোলা পাড় কট্‌কী শাড়ী এনেছেন তার জন্য। কি সুন্দর সৌখিন শাড়ীটি! কি ঘন নীল! যেন একখণ্ড আকাশ গায়ে জড়ানো। দু'জোড়া জুতো এনেছে। তারটা সোনালী-লাল গোসাপের চামড়া। মায়েরটা নীল-সবুজ। হিল-তোলা সু-জুতো মা চান না, পরা অভ্যাস নেই। তিনি পরেন নাগরা আর চ'টি। সুতরাং দু'জোড়া জুতোই মঞ্জুর হয়ে গেল। কি মজা! মায়ের

জুতোটা বড়, এখন পায়ে লাগবে না। বাক্স করে কাপড়-ছাড়ার ঘরে আপনার জুতোর পা-দানীতে রেখে দিল সে। নূতন জুতো, নূতন কাপড় প'রে, গলায় পুরীর চন্দন-কাঠের মালা জড়িয়ে মঞ্জুর মনে হ'ল সে মস্ত বিলাসী, মস্ত ধনী হয়ে গেছে। নূতন শাড়ীর গন্ধ, জুতোর মচ্‌মচানি, চন্দনের সুবাস, বন্ধুর বাড়ীতে যাবার আনন্দ, সব মিলিয়ে বিকালটা স্মরণীয় হয়েছিল সেদিন।

চাকরকে পিছনে নিয়ে রাস্তায় পা দিয়ে মঞ্জু দেখল, টুনু তাদের বাড়ীর সামনে গাড়ীতে বসে আছে। মা-মাসী পাউডার মাখা মুখে রেশমের জামা, জরীপাড় শাড়ী প'রে গাড়ীতে উঠছেন। টুনু গলা বার করে দেখতে লাগল সু-সজ্জিতা মঞ্জুকে। মঞ্জুর বেশ একটু গর্বের ভাব হ'ল। দেখুক, মঞ্জুও সাজতে জানে। কিন্তু পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সে, টুনু গাড়ীতে। টুনুর সঙ্গে তফাৎ কত! মনটা দমে গেল মঞ্জুর।

টুনুর কাকা টুনুকে কি যেন বল্লেন। টুনু ডাকল—"মঞ্জু, এস না। কোথায় যাচ্ছ? আমরা নাবিয়ে দিচ্ছি।" মঞ্জু ঘাড় নেড়ে হেসে তাড়াতাড়ি হেটে এগিয়ে গেল। সে নিজে তো লজ্জা পেতই, তা'ছাড়া বাবা অন্যের গাড়ীতে বেড়ানো ভালবাসতেন না।

আরতি প্রতীক্ষা করছে। রেণু ঘোষকেও আসতে বলা হয়েছে। মিনতি, নীলিমা, রেণুকা লাহিড়ীও আসবে। মা রান্নাঘরে লুচি-ডালনা রাঁধছেন। আরতি মেজদির সাহায্যে

ঘরদোর গুছিয়েছে। দোতলায় শোবার ঘরের মেঝেতে শতরঞ্চ পাতা। এখানে বসা যাবে। নীচে গলা শোনা গেল। রেণু ঘোষের বাড়ী যুগলকিশোর দাস লেনে, অর্থাৎ সবচেয়ে কাছে। সে-ই আগে এসেছে। সুন্দরী মেয়ে। উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রং, যেন জলে-ধোয়া চিকচিকে কলাপাতা। লম্বা, দোহারা চেহারা। আলগা চলা-ফেরা। বেশভূষায় বেশ দৃষ্টি, সৌখিন মেয়েটি সবদিকে। বাবা না থাকলেও ভাইরা ভালবাসেন। ভাল কাপড়-চোপড়ের-দুঃখ নেই। আর সর্বদা ভাল শাড়ী পরত সে। অন্য মেয়েদের মত বাক্সে তুলে নেমন্তন্ন বাড়ীর আশায় পচিয়ে ফেলত না। তার পরণে মুর্শিদাবাদী রেশমের ছাপা শাড়ী। জামা মিলিয়ে পরা। পায়ে ছাগলের চামড়ার সাহেবী ধাঁচের জুতো। চুলগুলো রুক্ষ বেণীতে বাঁধা। ডগায় চওড়া খয়েরী ফিতের ফুল।

সে বসতে না বসতে মিনতি, নীলিমা এল চলে। তারপর মঞ্জু। রেণুকা লাহিড়ীও এসে মঞ্জুর পাশে বসল। কিছুক্ষণ গল্প গুজব, গান বাজনা চলল। যার যা শক্তি সে তা করল। 'অদ্ভুত রামায়ণ' অভিনয় নিয়ে আলোচনা হ'ল। পড়াশুনা কার কতদূর হয়েছে সে গবেষণা হ'ল। তারপর আরতির মা সকলকে ভূরি-ভোজন করালেন।

তারা যখন বাড়ী ফিরতে আরম্ভ করল তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে পূর্ণিমার। ছোট ছোট গলিগুলোকে যেন রূপোর চাদরে মুড়ে দিয়েছে। কিছুদূর যাবার পরে রেণু লাহিড়ীর মনে পড়ল

লেসের রুমালখানা সে আরতির বাড়ী ফেলে এসেছে। মিনতি, নালিমা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল, রেণু ঘোষ বাড়ী চলে গেল। দাদা তাকে সিনেমাতে নিয়ে যাবেন। রেণু লাহিড়ী, মঞ্জু দু'জনে আবার গলির মধ্যে আরতির বাড়ী গেল। চাকর পথে রইল। যেগুলি দিনের রোদে একরকম, রাত্রে চাঁদের আলোয় সেগুলোর অন্য চেহারা। মঞ্জু রেণুকা লাহিড়ীকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "এইটে, না পরের টা?" "কি জানি, ভাই? সমস্ত বাড়ীই এক রকম দেখতে এখানে। এইটাই ঠিক।" দু'জনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে দরজায় ঘা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কাঁপা বুড়োটে গলায় শোনা গেল, "এস বাছা, বোস বোস। হাড়-জ্বালানী আমার, এস।"

দু'বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। মঞ্জু ভয়ে ভয়ে বল্ল, "আরতির মা। আমরা এত খেয়ে দেয়ে আবার ফিরে এসেছি দেখে বোধ হয় চ'টে গেছেন। চল্ পালাই।"

রেণুকা ইতস্ততঃ করতে লাগল। দিদি লেস্ বুনে বুনে ফুল তুলে রুমাল করে দিয়েছে। চমৎকার জিনিস। আরতির কাছ থেকে দু'খণ্ড বাঁধানো 'মৌচাক' সংগ্রহ করেছিল মঞ্জু, ছুটিতে পড়বার জন্য। তা-ও তো পড়ে আছে। মঞ্জুকে সে কথা রেণু মনে করিয়ে দিল। মরিয়া হয়ে দু'বন্ধুতে আবার দরজায় ঘা দিল। এবার স্বর শোনা গেল আরও জোরে,—"ওরে আমার সোহাগী, আয় পিঁড়ে পেতে দি। পিঠটি ভাঙ্গি লাঠির ঘায়ে।"

রেণুকা বল্ল, "ছিঃ ছিঃ একি? আরতির মা তো এমন নয়,—ভদ্রমহিলা তিনি।" মঞ্জু ফিস্ ফিস্ করে বল্ল, "বুঝছিস্ না।

তিনি হয়তো আমাদের আসা-যাওয়া চান না। আরতি জোর ক'রে ডেকেছিল। এতসব রান্না আমাদের জন্যে করতে হয়েছিল। আমরা বিরক্ত করেছিও খুব। তাই ফিরে এসেছি দেখে রাগ সামলাতে পারছেন না। কেন এসেছিলাম, ভাই ?"

আবার শোনা গেল, "কইগো, এলে না কেন ? এস গো এস, দোর খুলে দিচ্ছি তারপরে যমের দুয়োর দেখিয়ে দিচ্ছি।"

দু'জনের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। কথাটি না ব'লে পা টিপে টিপে রোয়াক থেকে নেমে এল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে এক মিনিট দাঁড়াতে, পাশের বাড়ীর দরজা খুলে আরতি মুখ বার করল, "ডলি বলছিল তোমরা ফিরে এসেছ। তা' ওবাড়ীর সামনে কেন ?"

"এ্যা ! তা'হলে এটা তোমাদের বাড়ী নয় ?"

"বাপ্‌রে ! এক মিনিটে এত ভুল ? এইতো এই বাড়ী আমাদের। ভুলে জিনিস ফেলে গেছ না ?"

আরতির বাড়ী ঢুকে ধড়ে প্রাণ এল দু'জনের। আরতির মা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, "একটু বোস মা, আবার দেখবার ভাগ্যি হ'ল যখন।"

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা পাশের বাড়ী বুড়ীমত চেঁচায় কে ?"

রেণুকা ব'লে উঠল, "জানিস আরতি, মঞ্জু ভুল ক'রে বলছিল সে তোর—উঃ !"

মঞ্জুর বে-পরোয়া চিম্‌টি রেণুকার হাতে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। আরতির মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হোল মা? পিঁপড়ে কামড়াল না কি?"

মঞ্জু তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ওকে খুব পিঁপড়ে কামড়ায়। পথে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, আমরা চল্লাম।"

আরতি এগিয়ে দিতে দিতে বল্ল, "এই বাড়ীতে যার কথা বলছ, তিনিই বাড়ীর গিন্নী। এখন পাগলের মত হয়ে গেছেন। বেশ ভাল থাকেন, হঠাৎ আবার যাচ্ছেতাই গালিগালাজ আরম্ভ করে দেন।" হাসতে হাসতে মঞ্জু রেণু চাঁদের আলোতে বাড়ী রওনা হ'ল।

সাত

চন্দ্রার বাড়ী। বড় রাস্তার ওপরে বিরাট বাড়ী। সামনে বাগান। পাশে ঘাসের খোলা জমি। বাড়ীটা স্কুলের কাছাকাছি। বাড়ীতে একের বেশী গাড়ী থাকলেও চন্দ্রা-নন্দা বেশীর ভাগ হেঁটেই যাতায়াত করে। ভাইদের সংখ্যা অনেক, গাড়ী সাইকেল মোটর-বাইক দিনরাত ঝক্‌ঝক্ আওয়াজ করছে। ভাইরা এই বা'র হচ্ছে, এই আসছে।

আজ গাড়ী করে চন্দ্রা ফিরেছে। দোতালার ঘরে চন্দ্রা বইখাতা রাখল। ঘরটি প্রকাণ্ড, হল বল্লেও চলে। ড্রেসিং-টেবিলে একগোছা ফুল সাজান আছে—রজনীগন্ধা, গোলাপ।

জামা-কাপড় ছেড়ে সে নীচে চায়ের ঘরে গেল। চা, স্যাণ্ডউইচ, ঘরে ভাজা মাংসের সিঙ্গাড়া খাওয়া শেষ করে দুজনে ওপরে এল। বসবার ঘরও দোতলায়। নূতন অর্গান এসেছে, প্রকাণ্ড দেখতে—মন্দিরের চূড়ার মত। দু'পাশে বাতিদান, স্বরলিপি খোলা আছে।

"দাদু, একটু বাজানা। নাচি।" ছোটবোন নন্দা বাজাতে লাগল, চন্দ্রা নাচতে লাগল।

"নাঃ, কবিতাটা বল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নাচটা করি।"

"ও আমি পারব না মঞ্জুর মত।"—আবদেরে মাথা দুলিয়ে নন্দ বলল। "তার চেয়ে 'কে এলে নূপুর পায়ে' গানটা গাই, এইটা নাচ।"

চন্দ্রার নাচ ঝর্ণাধারার মত সাবলীল। তারও জীবনে আজকাল স্বপ্ন এসেছে।—সে হবে নৃত্যশিল্পী। ইসাডোরা ডান্‌কান ব'লে একজন বিদেশী মেয়ে ছিলেন, তিনি নাচের জন্য জগতে সব ভাসিয়ে নিজের পথ বেছে নিয়েছিলেন। নাঃ, শিল্প ছাড়া জীবন কি? দাদারা যে সব ইংরেজী পত্রিকা আনেন তাতে কত নাচের ছবি! ছায়াছবিতে কত নাচ! চন্দ্রাও নিজে নাচ সৃষ্টি করবে। এই বাড়ী, গাড়ী, আমোদ—সব কিছুর ওপরে আছে একটি জগৎ—কলা, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান। সে জগতের সন্ধান ওই রোগা, কালো মঞ্জু জানে, যদিও কপাল তার উঁচু, মুখ থ্যাবড়া। কি স্বপ্ন দেখে মঞ্জু? পৃথিবীতে ভাল করতে চায়, নিজে ভাল হতে চায় ও। মোটা

বই পড়ে ও সব সময়। স্কুলে বইয়ের আলমারীতে ইংরেজী বই সব। বাংলা নভেল যা আছে, সেকেলে। তাই ইংরেজী বইয়ের স্বাদে মেয়েরা অভ্যস্ত। ক্লাসের অন্য মেয়েরা যখন 'Coming through the Rye' 'Home Influence,' 'Good wives' পড়ছে, তখন মঞ্জু ধূলো ঝেড়ে উঁচু তাক থেকে Dickens, Thackeray, Eliot, এঁদের বই নিয়ে মেতে আছে। কি চমৎকার লেখে মঞ্জু, কিন্তু বোঝা শক্ত কি যেন বলতে চায়? ওর চেয়ে আরতির লেখা সহজ, মিষ্টিও বেশী। কিন্তু, মঞ্জুর লেখায় কি যেন আছে! কত রকম ধারণা মাথায় আসে মঞ্জুর। নাচ, অভিনয়, আবৃত্তি, খেলা, সমস্ত কিছুতে নূতনত্ব এনে দেয় সে। কিন্তু মঞ্জুর স্বভাব মাঝে মাঝে কেমন পাগলাটে হয়! একদিন দেখা গেল গোটা মাঠটা একা একা হাত তুলে লাফাচ্ছে। প্রায়ই আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে! রাগও আছে মঞ্জুর। সহজে চটে যায়। ওর চেয়ে আরতি ভাল। কি আশ্চর্য্য মেয়ে! কখনও আরতি ঝগড়া করে না। কি সত্যবাদী! কি কর্ত্তব্য-জ্ঞান!

মঞ্জুর কথা মিলিয়ে গেল, আরতি ভেসে এল। শান্ত চোখের চাউনি, মুখে সৌম্যভাব। কারুর দুঃখ দেখলে তখনি মন গলে যায়। সকলের উপকার করে বেড়ায়। খেলাধূলায় ভাল। গায়ে জোর কি! একদিন পাতলা মঞ্জুকে পাঁজাকোলে করে সারা স্কুল বেড়িয়েছিল। 'পড়ে যাব, পড়ে যাব', বলে মঞ্জুর সে কি চীৎকার!

"হাসছ যে ছোটদি, নাচতে নাচতে?—আমি আর বাজাতে পারব না, হাত ব্যথা করছে।" হাত ঝাঁকিয়ে দানু বাজনার টুল থেকে উঠে এল। এক পিঠ ঢেউয়ের মত চুল আয়নার সম্মুখে ব্রাশ দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বল্ল, "মঞ্জুর বইটা এনেছ?"

মঞ্জু 'স্পর্শমণি' নামে ছোটদের একখানা উপন্যাস লিখছে। একটু একটু করে লিখে আনে আর মেয়েরা গোগ্রাসে গেলে। কেউ বা বাড়ী নিয়ে আসে। দানুও একজন পাঠিকা, দিদির বন্ধু মঞ্জুর বই সে দিদির মতই আগ্রহে পড়ত।

"এনেছি, আমার বইয়ের মধ্যে আছে।" চন্দ্রা নূতন ভঙ্গি অভ্যাস করতে লাগল।

মা ঘরে ঢুকলেন। শাদা থান গরদ, পুরোহাতা শাদা রেশমের জামা। চোখে রিম্‌লেস চশমা, পায়ে উঁচু গোড়ালির কাল জুতো। ব্রাহ্মিকা ধরণের শাড়ী পরা। আত্মীয়-বাড়ীর উপাসনা থেকে ফিরে এলেন।

"চানু, ফের স্কুল থেকে এসে নাচানাচি করছ? বলেছি না একটু বিশ্রাম নিতে। শরীর খারাপ হয়ে যাবে না?"

মায়ের কথায় 'না' বলবার শক্তি চন্দ্রার ছিল না। সে নাচে ক্ষান্ত দিল। শাদামাটা চৌকির মত আধুনিক স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে পড়ল। দাদাদের মুখে শোনা বিদেশী গান গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে ভাবতে লাগল—"Home, home, sweet home"—

আরতির স্বভাব ভালো। কিন্তু, রেণু ঘোষ ভারী গাবলীল। সুশ্রী দেখতে। একটা শাদা অর্গাণ্ডির জামা রেণু প্রায়ই পরে। আস্তিনে নীল রেশমের কাজ করা। বলে, শেতের কাজ। গৌরী আরও ভাল দেখতে। কত বড় ঘরের মেয়ে! রেণু লাহিড়ীর চুলগুলো কি সুন্দর! রেণু ঘোষের মুখখানা কত মিষ্টি! রেণু ঘোষের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব সে করতে চায়। মঞ্জুকে বড় ভাল লাগে, কিন্তু মঞ্জুতো ভাল দেখতে নয়। চন্দ্রা অন্য গান ধরলো,—"How I miss you, how I miss you"—উষাদি প্রথম শ্রেণীতে পড়তেন, এখন কলেজে চলে গেছেন। ভাল অভিনয় করেন। শাহাজাদার সাজে মানায় চমৎকার। বনছায়া, না টুন্টি উঁচুতে পড়লেও সমানভাবে মিশতে পারত। তর্‌ভরে ফর্সা মুখ, গলার স্বর মিছরির মত মিষ্টি। শৈবলিনীদি'র চোখগুলো খুব বড়। শিবানীদি'র শরীরটা ছিপের মত ছিপছিপে। দীপ্তিদি কি সুন্দর শাড়ী পরেন! সত্যি, সুন্দর জিনিস কত ভালো!

মিস্ বাসু চন্দ্রাকে তো ভালবাসেন। মেয়েরা কেন যে এত নিন্দা করে ওঁর? প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তিনি, সুদৃষ্টিতে থাকা ভাল। কেউ বোঝে না, খালি তাকে মিস্ বাসুর 'ফেভরিট,' 'ফেউ' বলে ক্ষ্যাপায়। মঞ্জু ভারী নিষ্ঠুর। কি বলে যে ও? কিন্তু কি পড়াশোনায় ভাল মঞ্জু! নাঃ, চন্দ্রা মঞ্জুর মত হবেই। সন্ধ্যা হয়েছে, উঠে পড়তে বসা যাক। মন দিয়ে যখনি সে পড়াশোনা করে, পরীক্ষার ফল ভাল হয়। আরতি নিয়মিত

পড়াশোনা করে, পড়তেও ভালবাসে ও। একটি পড়ার কাজ ওর বাকী থাকে না, উঠে পড়া যাক।

আলো জ্বালিয়ে চন্দ্রা বইখাতা বাছতে লাগল 'দিন-লিপি' মিলিয়ে। কাল শনিবার ছুটি, তবু পড়াশোনাতে বসা ভাল। মাঝে মাঝে তার মনটাও শক্ত হয়, কোন হুজুগে সে মাতে না। ঠিক মত পড়াশোনা করে যায়। যখন প্রাণ দিয়ে সে পড়ে তখন ফলও ভাল হয়। একবার তো সে ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় পর্য্যন্ত হয়েছিল। বাড়ীতে দাদাদের সাহেবী কেতায় ইংরেজীটা শিখে নিয়েছিল, ইংরেজী বই পড়াও অভ্যাস ছিল। ফলে ইংরেজীটা ভালই হয়েছিল। বাংলা বানান কিন্তু অসম্ভব ভুল লিখত চন্দ্রা। একদিন বোর্ডে কি একটা লিখতে যেয়ে সে 'সর্প' বানান লিখেছিল 'সপ্প্য' এই রকম করে। মঞ্জু বলেছিল থিয়াটারী ভঙ্গিতে "সপ্প্য, একে দংশন করো না কেন?" মঞ্জু এত নিষ্ঠুর হয় সময় সময়। সর্প চন্দ্রাকে কামড়ালে যেন মঞ্জু খুসী হত। চন্দ্রার মন খারাপ হয়েছিল কথাটা শুনে। কিন্তু ক্লাসে একটু মন খারাপ হলে, একটু চোখে জল আসলে মেয়েরা 'সেন্টিমেণ্টাল' বলে এমন ক্ষ্যাপায়! 'অদ্ভুত' কথাটার মত এটাও যেন গালাগালি। মঞ্জু নিজে কবি, কিন্তু 'সেন্টিমেণ্টাল' বলে ভাবপ্রবণকে সে ঠাট্টা করে। মঞ্জুকেও তো ভাবপ্রবণ বলা চলে, নয় কি? এই তো স্কুল-ম্যাগাজিনে মঞ্জুর কবিতা বেরিয়েছে, ভাবপ্রবণতায় ভর্তি। পড়ে দেখি আবার—

স্মৃতি

রেখে গেছ স্মৃতি শুধু তব বরিষারি গগনের গায়,
রেখে গেছ হাসির আভাস কদমের পাতায় পাতায়।
সকাতর অশ্রুধারা বুঝি মুক্ত হয় বর্ষণেরি সনে,
রূপ তব রূপ পায় নিতি প্রভাতের তপন-কিরণে।
ধরা হতে চলে গেছ তুমি, ধরা তবু মৌন বেদনায়
ধরেছে সাদৃশ্য তব বুকে, আছি আমি তাই নিয়ে হায়।
বাণী তব গুঞ্জরিছে আজি বসন্তের পত্রের মর্মরে,
নূপুরের নৃত্য শুনি যেন তটিনীর মুখরিত স্বরে।
বকুলের মৃদু গন্ধ মাঝে মিশে আছে দেহের সুবাস,
প্রবাহিত শান্তি সমীরণ বলে দেয় তোমারি আভাস।
রেখে গেছ বেদনা তোমার হেমন্তের অশ্রুম্লান সাঁঝে,
স্মৃতি তব মিশে আছে মোর বিকল এ মরমেরি মাঝে॥

এত অল্প বয়সে এমন লেখা কি করে মঞ্জু লেখে? বিজয়াদি, হিরণদিও ভাল কবিতা লেখেন—মঞ্জুর নামই বেশী। বাঃ, কি চমৎকার! এখন? মঞ্জুকে ভাবপ্রবণ বলা যায় না? আচ্ছা, কাকে লিখেছে? বোঝা যাচ্ছে না। কেমন একটা দুঃখের ভাব! কিছুদিন আগে মঞ্জুর দিদিমা মারা গেছেন। মঞ্জু তাঁকে মনে করে লিখেছে। কি মন খারাপ লাগছে! কেন পড়লাম? চন্দ্রার চোখে জল এল।

চোখ মুছে বই হাতে চন্দ্রা পড়া তৈরী করতে প্রস্তুত হ'ল। ভাল মেয়ে তাকে হতেই হবে। এমন সময় দরজাটা খুলে লাফিয়ে এল নন্দা ভাইপো খোকনের হাত ধরে, "ছোটদি, শিগ্‌গির। সিনেমা।"

"কে যাবে ?"

"সবাই যাব। ওঠ, ওঠ। ময়নাদি, কমলদা সবাই এসেছেন।"

"এখন যে পড়বার সময়, দানু।"

"রাখ পড়া, এস, এস। শাড়ী বদলে নাও।"

দেখা গেল বই পড়ার বদলে চন্দ্রা ফুলতোলা সিফনের শাড়ী, কাল জর্গাণ্ডি জামা পরে তৈরী হয়ে নিল। বারান্দার ছোট গোল টেবিলে মা একা চা খেতে বসলেন। সব খাবার একা আলাদা খান তিনি। ভারী একা লাগে তাঁকে।

চন্দ্রার দিকে বাঁকান চোখে চেয়ে বল্লেন, "কাপড়টা আর একটু নামিয়ে পরে যাও। অত উঁচুতে শাড়ী পরা তোমাকে ভাল দেখায় না, চানু।"

চন্দ্রা আবার কাপড় ছাড়বার ঘরে ঢুকল।

আট

তৃতীয় শ্রেণীতে ইতিহাসের ঘণ্টা। মিস্ দত্ত ক্লাস নিচ্ছেন। পড়া নেওয়া হয়ে গেছে, এখন পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

বই পড়বার সময় তাঁর চোখে চশমা লাগে, এখন চশমা খোলা। দাঁড়িয়ে চকটা হাতে করে নূতন পড়ার ওপরে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তখন সব বিদেশী ভাষায় হ'ত কিনা।

ক্লাসে সূঁচ পড়লে শোনা যায়। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজাদের খণ্ডরাজ্যের খুঁটিনাটি কারুর ভাল লাগছে না। কিন্তু তারা ভয়ে চুপ করে বসে আছে। না, সবাই বসে নেই। যারা পড়া পারে নি, তারা দাঁড়িয়ে আছে। যারা একটিও মাত্র দরকারী কথা পাশের মেয়ের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছে, কথা বলার শাস্তি পেয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তৃতীয় শ্রেণীর মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, এতো সামান্য কথা। মিস্ দত্ত প্রথম শ্রেণীর মেয়েদের পর্য্যন্ত, ইচ্ছা হলে বেঞ্চির ওপরে দাঁড় করিয়ে দেন। এঁর ঘণ্টায় মঞ্জুরও মুখ শুকিয়ে যায়। পড়া বলতে ভুল কখনও হয় না তার, কিন্তু কি জানি কখন মিস্ দত্তের রাগ দপ্ করে কি কারণে জ্বলে উঠবে কে জানে?

পড়া বোঝানো শেষ হতে হতে ঘণ্টা পড়ল, এখন টিফিন। রুমালে চকের হাত মুছে রোষদৃষ্টিতে একবার দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে চেয়ে মিস্ দত্ত চলে গেলেন। হাঁফ ছেড়ে মেয়েরাও বাইরে এল, টিফিনের বাক্স হাতে। কিন্তু অন্যদিনের খোলামেলা ভাব কারুর নেই। কারণ আরো দু'টো ৪৫ মিনিটের ঘণ্টা আজ মিস্ দত্তের আছে। তিন ঘণ্টা তাঁর ক্লাস একই দিনে। এবার তৃতীয় শ্রেণীর অনেকগুলো ক্লাস মিস্ দত্ত চালিয়ে দিচ্ছেন।

এতে মেয়েদের মধ্যে একটা নৈরাশ্য এসেছে। তারা আর এত নীরস লোকের রুক্ষ শাসন সহ্য করতে পারছে না। শিক্ষয়িত্রীরা সবাই বোর্ডিংএ চা-খাবার খেতে চলে গেলেন। মিস্ বাসুর খাবার কাঠের খুঞ্চেতে শাদা ঢাকনিতে ঢাকা অবস্থায় ঝি বোর্ডিং থেকে দিয়ে গেল। মঞ্জু চেয়ে দেখল শাদা ধব্‌ধবে কাপড়ে মুড়ে খাবার এলে কি সুন্দর দেখায়। আজ দীপ্তিদি আর কণিকাদি দু'জনেই সখ করে রঙীন শাড়ী পরে স্কুলে এসেছিলেন। তাঁরা বোর্ডিংএ থাকেন, জলখাবার খেতে এখন যাচ্ছেন, পথে তৃতীয় শ্রেণীর মেয়েদের নজরে পড়ে গেলেন। সবাই মুখ টিপে হাসল, কণিকাদি পরেছেন কাশীপাড় হলুদ শাড়ী, দীপ্তিদি কালপাড় গোলাপী। হঠাৎ শাদা শাড়ী-পরা মাষ্টারনীদের রঙীন হ'য়ে উঠতে দেখে এত দুঃখেও মেয়েরা চন্‌মনে হ'য়ে উঠল।

"হ্যাঁ ভাই, হঠাৎ রঙীন শাড়ী পরলেন কেন ওঁরা ?" ছোট বীণা প্রশ্ন করল।

"ওঁদের বোধ হয় বিয়ে হ'বে, তাই।" অণিমা উত্তর দিল, না ভেবে-চিন্তেই।

"আরে সাহেব কি বলে ?" মিনতি হো হো ক'রে হেসে উঠল। "ওঁদের বিয়ে হবে না—ওঁরা ইচ্ছা করে তবে বিয়ে করবেন।"

মিনতি কদাচিৎ আপত্তিকর কথা ব্যবহার করলেও এত মজা করে বলত যে খারাপ শোনাত না।

বেচারী অণিমা নিছক ভালমানুষ, কথা কম বলে, চোখে পুরু কাঁচের চশমা পরেও ভাল দেখে না। আরতির সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। অঙ্ক ভাল কষে। দাঁতে চিবিয়ে কথা উচ্চারণ করবার জন্য নাম হয়েছে তার 'সাহেব'। ওই নামই চল্‌তি।

সাহেব লজ্জা পেয়ে চোখ পিট্‌পিট্‌ করে সরে পড়ল দল থেকে।

মঞ্জু, আরতি ততক্ষণে কোন মতে খাওয়া শেষ করে ফেলেছে। হাত মুখ ধুয়ে এখন খেলা-গল্প-বেড়ান-লাইব্রেরী —কোনটাই হবে না। টিফিনের পরে ভূগোল নেবেন মিস্‌ দত্ত। পড়া হলেও ঝালাতে হয় একটু। কারণ উৎপন্ন দ্রব্যের বা আমদানী-রপ্তানী দ্রব্যের তালিকা ধরলে একটি নাম ভুল হয়ে গেলেও মিস দত্তের মতে পড়া না পারা। যথা—টি, কফি, সিঙ্কোনা ইত্যাদি এক বোঝা নাম থাকলে 'টি' কথাটি বাদ গেলেই ভুরু কুঁচকে যাবে মিসের। দু'টো বাদ গেলে, পড়া হয়নি, Stand up অপমান হবার ভয়ে সব মেয়েই টিফিনের ছুটিটুকুতে চোখ-কান-বুজে পড়া মুখস্ত ক'রে যেত। ক্লাসে বসে বই খুলে পড়া করত, 'বই বন্ধ কর' আদেশ পাবার আগে পর্য্যন্ত। এই ভাবে মরি-বাঁচি করে শুধু পড়াটুক বলবার জন্য সাময়িক ভাবে যে পড়া, তাতে কি জ্ঞান লাভ হ'ত সে কথা মিস্‌ দত্তই জানেন।

আজও করিডোরে, মাঠে পায়চারী করে মেয়েরা পড়া করছে। সমস্ত দিনটা যেন একখণ্ড জমাট সীসার মত গলায়

ঝুলছে তাদের। বলতে কি, যতদিন মিস্ দত্ত এতগুলো করে ঘণ্টা নিতেন, ততদিন তাদের সমস্ত স্কুল-জীবনটাই নীরস হয়ে উঠেছিল। মনে হত স্কুলে যেয়ে কি লাভ? অত পড়া ঠিক মত বলতে না পারলে শাস্তি। সামান্য ছুটির সময়টাতে গল্প-খেলা কিছুই হবে না। মরি-বাঁচি করে মুখস্থ করতে হবে, যাতে পড়া না ঠেকে যায়।

যাক্, হরি-হরি করে কোন মতে ভূগোলের ক্লাস শেষ হয়ে গেল। যথানিয়মে কতকগুলি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া বিশেষ কিছু হ'ল না। শুধু জলি দত্ত 'আরকিপ্লেগোকে' 'আরচিপ্যালাগো' উচ্চারণ করাতে মিস্ দত্ত খুব চটেছিলেন। সামনের শনি-রবিবার ছু'টো কিন্তু মিস্ দত্ত টাস্কের ভারে নুইয়ে দিলেন। ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকতে হবে, উৎপন্ন দ্রব্য দেখিয়ে দেখিয়ে, সঙ্গে আমেরিকা মহাদেশের ম্যাপ। সোমবারে চাই। ঘণ্টা শেষ হ'ল। এর পরে ইংরেজী কবিতা, ওই মিস্ দত্তই নেবেন। তিনি বার হ'য়ে গেলেন। টিচারস্ কমনরুম থেকে এক গ্লাস জল খেয়ে তাজা হ'য়ে ফিরতে। মেয়েরা নিঃশ্বাস ফেলে ডেকস্ খুলে ভূগোলের বই তুলে Palgrave's Golden Treasury বার করে ঝুঁকে বসল চোখ বুলিয়ে নিতে। গৌরী ফিসফিস্ করে বল্লে, "অতো ম্যাপ যদি আঁকব তবে 'উইক্লি' পরীক্ষার পড়া করব কখন?" এই সময়ে স্কুলে নিয়মিত সাপ্তাহিক পরীক্ষা নেওয়া হ'ত প্রতি মঙ্গলবারে। এ মঙ্গলবারে ইংরেজী ব্যাকরণ

পরীক্ষা আছে। মঞ্জু বলে উঠল, "সত্যি, কি হবে?" মিনতি বল্লে, "মঞ্জুর আর কি? চোখ বুলোলেই হয়ে যাবে। আরতি রাত জেগে ঝাড়া মুখস্ত করে আসবে। মরব আমরাই। তা বাপু, বলা উচিত ছিল ওঁকে সোমবার ম্যাপ দিতে পারব না। মঞ্জু বললে না কেন?"

"বারে, আমি কি একা একা বলব?"

নন্দিনী গলা উঁচু করে বলে উঠল, "তা' বলবে কেন? তোমার যে দরকার নেই। সেল্‌ফিশ্!"

এ কথাটা কেউ সহ্য করতে পারত না। মঞ্জু ক্ষেপে গেল, "কী? আমি তোমাদের ছাই ফেলার ভাঙা কুলো?" সকলে একটু সন্ত্রস্ত হ'ল। মঞ্জুর রাগ তারা ভয় করে। কথা কাটাকাটি হয়ত প্রকাণ্ড ঝগড়ায় শেষ হত, কিন্তু মিনতি উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে মঞ্জুর মুখের কথা আগ্রহে লুফে নিল, "কুলোই ত', কুলোই ত'! তুমি ছাড়া আমাদের কথা কে বলবে?" গৌরী সায় দিল, সকলেই খুসী হ'য়ে উঠল। ঠিক হ'ল মঞ্জুই উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাপ আনবার দিন বদলে দিতে বলবে।

চন্দ্রা প্রাণপণে কবিতা মুখস্ত কর্‌ছিল। বই বন্ধ করে একবার নিজের মনে বলে, আবার ঠেকে গেলে বই উল্টে দেখে। কাল তার ময়নাদি'র জন্মদিন গেছে। উৎসবের মধ্যে সে পড়া করতে পারে নি। ঝগড়ার মিট্‌মাট হ'য়ে গেলে সে করুণভাবে বলে উঠল, "আমার গ্রামার একটুও

পড়া হয় নি। সারা সপ্তাহের পড়া করা কুলিয়ে ওঠে না। পরীক্ষার পড়া কবে করব ?”

সতী বলল, “এত লোকের কত হয়! মিস্ দত্তের কিন্তু একদিনও অসুখ করে না। রোজ আসা চাই।” সকলের কথাটা সত্যি বলে মনে হ'ল। কিন্তু তারা সেদিন একবারও ভেবে দেখল না, যে তাদের যেমন মিস্ দত্তের ক্লাস ভাল লাগছে না, মিস্ দত্তেরও হয়ত তাদের ক্লাস নিতে তেমনি খারাপ লাগছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরস বিষয় নিয়ে ছোট মেয়েদের কাছে চীৎকার কারুরই ভাল লাগে না। একঘেয়ে জীবন। ভবিষ্যতের কোন আশা নেই। আজকাল মেয়েদের কাজকর্মে সুযোগ সুবিধা মিলছে। মিস্ দত্তের সময় ছিল না। অথচ তিনি মনে করতেন যে, তাঁর মধ্যে প্রতিভা আছে। বাইরে ঘুরে শিক্ষা নিয়ে আসতে পারলে হয়তো তিনি বড় কাজ পেতেন। তা না, এই স্কুলে পড়ানো। মাইনেও বেশী নয়। মেয়েরা বুঝত না যে তাদের জীবনে আশা আছে, স্বপ্ন আছে। একদিন তারা বড় হবে, ভবিষ্যৎ তাদের মধু-মাখানো। তারা রাজা আর্থারের নাইট। কিন্তু মিস্ দত্তের জীবনে আর কিছু হবার উপায় নেই। তাদের মা-বাবা আছেন, ঘর আছে। মিস্ দত্তের কেউ নেই, রোজগার বন্ধ করলে তাঁর একদিনও চলবে না। অসুখ করলে বোর্ডিংএর ঝি-রাঁধুনী ছাড়া কে তাঁকে দেখবে ? চন্দ্রার মত মস্ত বড়লোককে বিয়ে করে আরামে থাকার স্বপ্নও তিনি এত বয়সে দেখতে

পারেন না। বোকা—বোকা মেয়েদের মাথায় বিদ্যে ঢোকানো, তাদের শাসনে রাখা, অষ্টপ্রহর এই কাজে তাঁর জীবন শুকিয়ে উঠেছে। এত কথা যদি মেয়েরা বুঝতে পারত তা'হলে কখনই মিস্ দত্তের ওপর রাগ করত না, তাঁকে একটু ভালবাসবার চেষ্টা করত।

মিস্ দত্ত তেজী বাঘের মত লাফিয়ে চেয়ারে বসলেন। একতলার কমনরুমে শুধু জল খাননি তিনি, মুখেও পাউডার বুলিয়ে এসেছেন! বই খুলে জিজ্ঞাসা করে নিলেন, আজ কি পড়া দেওয়া ছিল। শোনবার পরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠিক করতে লাগলেন কাকে প্রথমে জবাই করা যায়।

মেয়েদের মুখচোখ শুকিয়ে গেল, বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। অতি কষ্টে তারা মুখেচোখে একটা কাষ্ঠ-হাসির ভাব ফুটিয়ে বসে রইল, যেন সবাইকারই পড়া কণ্ঠস্থ, জিজ্ঞাসা করলেই হয় আর কি। তারা দেখছে মিস্ দত্ত সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেন পড়া ধরাবার আগে। যার মুখ বেশী শুকনো লাগে তাকেই ঠিক জিজ্ঞাসা করে বসেন নিষ্ঠুরের মত।

আজ শেষ বেঞ্চে আশার কপাল ভাঙল। বেচারা উঠে একটা দুটো লাইন বলে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। ফর্শা, মোটাসোটা মেয়েটি, মুখটা ছেলে-ছেলে দেখতে। ইংরেজ কবি ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতা 'Requseoat' পড়া হচ্ছে, অনেক মেয়ের কাছে শক্ত লাগে। আশা শেষ বলতে না পারায় পরের

মেয়ে মন্দাকিনীর পালা এল। মন্দা চক্রবর্তী লম্বা-ফর্শা, কাল চুল, বড় চোখ। সে বাড়ীতে মন দিয়ে পড়াশোনা করে, পড়া পারেও বেশ। উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে-ভয়ে সে আরম্ভ করল মুখস্থ বলা—

"Strew on her roses, roses,

And never a spray of you"—

মিস্ দত্ত ধমকে উঠলেন, "আগে শিরোনামা বল।"

আশার পড়া না পারা দেখে মন্দা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল! মিস্ দত্তের ধমকে তার সব গুলিয়ে গেল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে, ঢোঁক গিলে সে আবার সুরু করল—

"Requescat

Strew on her "roses, roses"—উচ্চারণটা হয়ে গেল —'রোজেচ্. রোজেচ্'—মিস্ দত্ত টেবিল চাপড়িয়ে বল্লেন, "ওকি? বল রোসেস্, রোসেস্।" মন্দা সজোরে চেষ্টা করল, "রোচেচ্ রোচেচ্" —

মিস্ দত্ত কটমট করে তাকিয়ে বল্লেন, "আবার? বলতো, রোস্?" "রোস্।" "এবারে তা'হলে বহুবচনে বল, রোসেস্, রোসেস্"—

"রোজেচ্, রোজেচ্"—

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মন্দা পড়া বলেছে ঠিক, কিন্তু কিছুতেই ওর মুখ থেকে গোলাপের ইংরেজী শব্দের বহুবচনটা শুদ্ধ বার হচ্ছে না। মিস দত্ত তাকে না বলিয়ে ছাড়বেন না।

ততক্ষণে মন্দার কাঁপুনী সুরু হয়ে গেছে, ডেস্কের কোণটা চেপে ধরে করুণ স্বরে সে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে: "রোজেচচ্"— কোথায় যে উচ্চারণে ভুল হচ্ছে কিছুতেই সে ধরতে পারছে না। কারণ, মিস্ দত্তের সহনুভূতির অভাব। ছোট মেয়েকে তর্জন গর্জন করে শেখানো যায় না, ভালমুখে বুঝিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাঁর ক্রমাগত ধমকে নার্ভাস হয়ে ভয়ে কাঁপছে যে, তার মাথা কি করে ঠিক থাকে?

ধস্তাধস্তির পরে মন্দার মুখ দিয়ে অর্ধেকটা ঠিক বেরুল, "রোজেস্, রোজেস্"—মিস্ দত্ত বুদ্ধিমানের মত আর জোর করলেন না। কারণ, ঘণ্টার অর্ধেক তখন কাবার হয়ে গেছে। পরে বহুদিন কিন্তু বন্ধুরা মন্দাকে ক্ষ্যাপাত, "রোজেচ্ রোজেচ্" ব'লে।

মন্দা ছাড়ান পেলেও মিস্ দত্তের মেজাজ চড়ে রইল ছয়ের কোঠা ছেড়ে সাতের কোঠায়। বেগতিক দেখে মেয়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিজেরা হাত-মুখ নেড়ে ঠিক করে নিল, ম্যাপ না এঁকে আনবার কথা বলা উচিত হবে না। মারাত্মক ভুল হবে সেটা।

মঞ্জু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এ দোষ ছিল তার। মাঝে মাঝে মন কোথায় চলে যেত। মন্দার ব্যাপার মিটে গেলে সে বাইরের দিকে চেয়ে উদাস হয়ে গেল। মিস্ দত্ত আড়চোখে লক্ষ্য করে বোমা ছাড়লেন, "ইউ মঞ্জুরী, Requescat মানে কি?" তক্ষুনি উত্তর এল, "Rest, এটা

ল্যাটিন শব্দ।” মিস্ দত্তের মেজাজ একটু শান্ত হ’ল। তিনি বল্লেন, “এই কবিতাটি নেক্সট্ ডে-তে ধরব। এখন Bells of Shandonটা হ’ক। সান্ত্বনা, বলত!”

সান্ত্বনা পড়াশোনায় ভাল নয়, তা ছাড়া বাড়ীতে অনেক কাজ করতে হয়। বহুদিন রান্না করে খেয়ে তবে সে স্কুলে যোগ দিতে আসে। হাতের নখে হলুদের দাগ লুকনো যায় না। বয়স কিছু বেশী তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে। সময় পায় না। পড়াশোনা কাজকর্ম সেরে সাজগোজ করে অন্য মেয়েদের মত ফিট্‌ফাট্ হয়ে আসতে পারে না। চুলে তেল চিট্‌চিটে, অগোছালো। কাপড় ঝুলছে, জামা পেটিকোটের তলা থেকে উঠে আসছে, জুতোর বোতাম ছেঁড়া। দেখলেই মনে হয়, সবদিকেই মেয়েটি পিছিয়ে আছে, এগিয়ে যাবার পথ সে পাচ্ছে না। মুখখানি তার ম্লান, চোখে ভীতুভাব—কিছুতেই যেন সে সাফল্যের চাবিকাঠিটি ধরতে পাচ্ছে না। কি করে সে পড়াশোনা পারবে, কি করে স্মার্ট হবে সে কথাটা কেউ তার কানে কানে বলে দিচ্ছে না কেন? নোঙর ছেঁড়া নৌকার মত সে যেন এলোমেলো ভেসে চলেছে, ক্লাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁধা নেই। নীচু ক্লাসে মিস্ বসু ক্লাসটাকে পাঁচটা ভাগ করেছিলেন, এক একটি ছোট দল একটি দলপতির অধীনে থাকত। সেই দলের মেয়েদের পড়া, পোষাক, সব কিছু দলপতি দেখে দিত। ফলে সবাই ভাল হ’বার সুযোগ পেত, কেউ পিছিয়ে থাকত না। দলগুলোর নাম ফুলের নামে

ছিল। দলপতি মঞ্জুর দলের নাম ছিল 'লোটাস,' চন্দ্রার দলের নাম ছিল 'রোস্,' নন্দীনীর 'লিলি,' এই রকম করে। এখন উঁচু ক্লাসে উঠে এ নিয়ম গেছে। কিন্তু থাকলেই ভাল হ'ত, সমস্ত স্কুলেই সান্ত্বনার মত মেয়ে আছে, তারা কি সারা জীবন পিছিয়ে থাকবে? অন্য মেয়েরা তাদের দেখবে না? হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে না সঙ্গে সঙ্গে?

সান্ত্বনা উঠে দাঁড়িয়ে থেমে থেমে কবিতা মুখস্থ বলতে সুরু করল। ইংরেজী উচ্চারণ তার খারাপ, কথা বলবার ভঙ্গীতে জড়তা। মিস্ দত্ত তাকে বা তার মত মেয়েকে দেখতে পারতেন না। তিনি পছন্দ করতেন ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে মেয়ে। এই সব মেয়েদের তিনি স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখাতেন, ভুলে যেতেন রূপগুণ না থাকলেও এদের মন আছে। ভাল মেয়েদের মত এরাও মানুষ।

নাচানো ছন্দের কবিতাটি সান্ত্বনার গলায় যেন শক্ত গদ্যের মত শোনাতে লাগল—

—"Oh, the Bells of Shandon
Sounds for-more grand on,
The pleasant water of the river Lee"—

মঞ্জু অসহিষ্ণু হয়ে ভাবল কি করে সান্ত্বনা পড়াশোনায় এত খারাপ হয়? কিছুক্ষণ শুনে মিস্ দত্ত ধমকে উঠলেন, "লজ্জা করে না, বুড়ো মেয়ে! একদিনও পড়া পার না। বল, ঠিক করে বল। আমি বলছি, শুনে বল"—

চুপ করে ধৈর্য ধরে সান্ত্বনা চেষ্টা করতে লাগল ঠিকমত বলতে। কিছুতেই পারলে না। মিস্ দত্তের ধমকে দিশাহারা হয়ে দুঃখভরা চোখ দুটি মেলে বারবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে শাস্তি হ'ল তার; ছুটির পরে স্কুলে দশবার কবিতাটি লিখে দেখাতে হবে। কঠিন শাস্তি। সারাদিনের পরে একঘণ্টা বসে লেখা একা বদ্ধ ঘরে। সান্ত্বনা টিফিন খেত না। ছুটির পরে মিস্ দত্ত যখন আকণ্ঠ খাবার খেয়ে আরাম-কেদারায় বসে চুল আঁচড়াবেন তখন সেই স্বাস্থ্যহীন, ক্ষুধার্ত মেয়েটি ঝুঁকে খাতার বুকে শাস্তির কাজ লিখে যাবে। ভরা পেটে এলাচী চিবোতে চিবোতে মিস্ দত্ত তাকে শাস্তির ঘণ্টার শেষে বাড়ী ফিরতে আদেশ দেবেন। বাড়ী ফিরে গরীব সংসারের হাড়-ভাঙা খাটুনি আবার কাঁধে তুলে নেবে সে। অবশ্য এই ছুটির পরে আটকে শাস্তি দেওয়ার নিয়ম ক্রমে ক্রমে কমে গিয়েছিল। মিস্ বাসু রুটি ও ছোলার ডালের একটা বাধ্যতা-মূলক টিফিনের ব্যবস্থা করেছিলেন—প্রত্যেকটি মেয়েকে খেতে হবে। কিন্তু এ নিয়ম বেশী দিন চলতে পারেনি। ভাল কিছু সহজে চলে না।

সান্ত্বনার কথা মনে পড়লেই আজও মঞ্জুর মনে ভেসে আসে, একটি রোগা ভীতু মেয়ে সকলের তাচ্ছল্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে পড়া বলতে চেষ্টা করছে। রাগী শিক্ষয়িত্রীর ধমকে সব গুলিয়ে যাচ্ছে তার, বিদেশী ভাষা সে বুঝতে পারছে না, বিদেশী শব্দ মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না।

রুক্ষ চুল উড়ছে অবুঝ মুখখানা ঘিরে। একটু আদর করে পড়া বোঝালে সে তো বোঝে। কিন্তু, তার কথা কে ভাববে?

জগতে কবে মিস্ দত্তদের সঙ্গে সান্ত্বনাদের সহযোগিতা হবে?

নয়

নন্দিনীর জন্মদিন। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন বিকেল। টিপ্-টিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তা জলে ভেজা। আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে একখানা হল্‌দে তেতালা বাড়ি রাস্তার ওপারে। একলা নন্দিনীদের গোটা বাড়িটি নয়। চেনা-জানা ব্রাহ্মপরিবারের লোকজন মিলে-মিশে রয়েছে ভাগে ভাগে। এ ভাবে থাকবার ফলে নন্দিনীর জীবনে বন্ধুর অভাব ঘটেনি। দোতালায় খুকু থাকে,— দেখতে ঠিক টস্‌টসে ন্যাসপাতির মত—আপেলের মত নয়, কারণ রং কালো। খুকু 'সন্দেশ' পত্রিকা রাখে। তাদের গুছানো, ছোট্ট ঘরে যেয়ে সেগুলো পড়ে পড়ে আসে নন্দিনী। অবশ্য মঞ্জুটার মত বই-পাগলা নন্দিনী নয়। মজা আবার, নন্দিনীর ডাক নামও 'খুকু'। এছাড়া আরো ভাড়াটের মেয়ে আসে-যায়। কেউ বেশী দিন থাকে, কেউ কম দিন। বাড়িটাতে বেশ একটা সরাইখানার ভাব আছে। বাক্স-বিছানা পেতে একদল বসে, গুটিয়ে অন্যদল ওঠে। নিজের নিজের অধিকার নিয়ে সবাই ব্যস্ত। তেতলায় ভাড়াটে মেয়েটা নন্দিনী-খুকুর চেয়ে ছোট। হ'লে কি হবে? কথা কি!

ছাদে উঠতে গেলেই বলে, "আমাদের ভাগে ছাত, উঠতে দেব না।" নন্দিনীও কম নয়। বাড়ির রকে 'আলু-কাব্‌লীওয়ালাকে' ডেকে মেয়েটা যখন আলু-কাব্‌লি কিনে টপ-টপ করে খায়, তখন চীৎকার করে নন্দিনী শোনায়, "আমাদের বসবার ঘরের সামনে রক নোংরা করলে যে বড় ? ঝাঁট দিয়ে দাও।"

মেয়েদের মা-বাবা কিন্তু এ-সব ছোটলোকী কথা শুনেও সব সময় মেয়েদের শাসন করেন না। অনেক সময়ে নিজেরাও এই ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে ঝগড়ায় যোগ দেন। নন্দিনীর মামা ধানুর সাইকেলের আলো চুরি গেল। সে বলে বসল, একতলার পেছন দিকের ভাড়াটে ছেলে গুলু চুরি করেছে। গুলু রুখে এল, তা'হলে তার ফাউণ্টেন পেনটা ধানু নিয়েছে। এ নিয়ে দু'পক্ষের মা-বাবা, ভাইবোন পুরো তিনটি দিন ধরে যেন যুদ্ধ-শিবির ফেলে কথার যুদ্ধ করল। নন্দিনী ও তার দলের খুকু, গুলুর বোন রাণীর নামে ছড়া কাটতে লাগল :

"আনি-রাণী জানি না—
পরের ছেলে মানি না।"

ওধারে রাণী; ছোটবোন টগর দু'জনে জিব কেটে, ভেংচে চোখ বন্ধ করে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে নাচতে লাগল উঠোনে এই বলে :—

"খুকু-খোকা গাধা-বোকা!
নন্দিনী, নন্দিনী, খায় সে দুধ-চিনি।"

দুটো ছড়ার কোনোটাই গালাগালি নয়। ভদ্রঘরের

ছেলে-মেয়ে তারা, বস্তির নয়। খারাপ গালাগালি শিখবেই বা কোথা থেকে? তবু, ওই ছড়া দুটোর ফল বিষময় হ'ল। দু'জনরাই চটে আগুন হ'ল। নন্দিনীর ছেলেবেলা থেকেই একটু মারামারির অভ্যাস ছিল। জব্দ হ'ল নন্দিনীরাই বেশী, কারণ তাদের ছড়াটা পাড়াতে চলতি ছড়া। রাণীদের ছড়া টাট্‌কা তৈরি করা। ভেতরে ভেতরে নন্দিনী ক্ষেপে উঠতে লাগল। শেষে তরতর করে সিড়ি দিয়ে নেমে এসে রাণীর মুখে সে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিল। রাণীর মা গালে হাত দিলেন,—"ওমা, ওমা! কোথায় যাব? মেয়েমানুষ মারামারি করে নাকি? কি দস্যি মেয়ে, বাবা!"

গুলু ছড়ি হাতে তেড়ে এল। তা দেখে নন্দিনীর ভাই খোকাও ব্যাট হাতে বেরোল। একটা ভয়ানক মারামারির গন্ধ পেয়ে নন্দিনীর বাবা দোতালা থেকে নেমে এলেন। লম্বা-চওড়া দশাসই মানুষ, রং কালো। অফিস থেকে ফিরে শোবার ঘরের আরাম-কেদারায় সবে পা তুলে বসেছেন, এমন সময়ে এই অঘটন। নিচে নেমে অবস্থাটা বুঝে প্রথমেই তিনি মেয়েকে ধমক দিলেন; "খুকু, ওপরে যাও।" তারপরে আপোষ করে ফেল্লেন। ব্যাপার অতদূরে যে গড়াবে এ তিনি ভাবেন নি।

বাইরে ঝগড়া না থাকলেও কিছুদিন ভেতরে ভেতরে রাণীদের সঙ্গে নন্দিনীদের শত্রুতা চলল। ব্যাঙ-চালান হ'তে লাগল। ব্যাঙ-চালানোর একটু ইতিহাস আছে, বলছি।

তোমাদের হয়ত ভাল লাগছে না। ভাবছ, নন্দিনীর জন্মদিন থেকে কেন একটা বিশ্রী ঝগড়ার কথায় নেমে এলাম? কিন্তু, পাঁচমিশিলা বাড়ীতে ছোটবেলায় থাকবার কুফল তোমরা জেনে রাখ। মনে রেখ, দশজনের সঙ্গে থাকতে হলে মিলিয়ে-মিশিয়ে থাকতে হয়। মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে স্বার্থত্যাগ করতে হয়।

ব্যাঙ-চালানোর শিক্ষাটা নন্দিনী পেয়েছিল সুখময়-প্রভাতের কাছে। ছেলেরা স্কুল ছেড়ে যাবার আগে শোধ নিয়ে গিয়েছিল। একদিন মাঠে দ্বিতীয় ঘণ্টায় প্রকৃতিপাঠের ক্লাস সেরে (বটানি যাকে বলা হয়) মেয়েরা সবাই ক্লাসে নিজের জায়গায় ফিরে দেখে অবাক কাণ্ড। ব্যাঙ, অসংখ্য ব্যাঙ চারিদিকে গিস্‌গিস্‌ করছে। নন্দিনী ডেস্ক খুলতেই প্রকাণ্ড এক কোলা ব্যাঙ 'ঘ্যাঁগোর ঘো' শব্দে লাফিয়ে নন্দিনীর কোলে এসে বসল, যেন আদুরে খোকনমণি। "ওরে মা, গেছি!" বলে নন্দিনী তো লাফিয়ে মরে আর কি। বেচারীর ঘেন্না বড় বেশী। ডান হাত দিয়ে কুৎসিৎ জন্তুটাকে কোল থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার ঘেন্নাতে বেচারী দু'তিন দিন হাত দিয়ে কিছু খেতে পারত না। চামচ দিয়ে খেত।

যারা ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করেছিল, সকলেরই একই দশা। রেণুকা লাহিড়ীর তো টিফিনের কৌটো থেকে ব্যাঙ বার হ'ল। ভাল খাবার এনেছিল সে বাড়ী থেকে সেদিন। সব ফেলা গেল। অন্য মেয়েরা নিজেদের খাবার থেকে তাকে খাওয়াল টিফিনে!

নীলিমার অ্যাটাশে-কেস্ খোলা মাত্র দেখা গেল দু'টি ব্যাঙ—একটি নয়। যোড়া ব্যাঙ ঘুমিয়ে আছে বই-খাতার আড়ালে। দরোয়ান ডেকে সে ব্যাঙ ফেলতে হ'ল।

মিনতি গৌরী পেল আরও চমৎকার উপহার—ঠোঙা ভরা ব্যাঙাচী। ডেস্কের ডালা তোলা মাত্র কিল্‌বিল্ করে মুখে-চোখে ছড়িয়ে পড়লো ধূলোর মত। মিনতি 'রাম-রাম' করে ওয়াক তুলতে লাগল। গৌরী কল-ঘরে মুখ ধুতে যেয়ে বমি করে ফেলল।

সারা ক্লাসে এইসব ব্যাঙ ছড়িয়ে থৈ-থৈ করতে লাগল। ক্লাসের নিয়ম ভুলে, 'বাবারে মারে' করে সবাই লাফিয়ে কোন-মতে ব্যাঙ ডিঙিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল, কেউ বা ব্যাঙাচী মাড়িয়ে ঘেন্নায় অস্থির হয়ে পড়ল।

মিস্ বাসু তদন্তে এলেন। ক্রমে ক্রমে একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়ল। দুই ছেলে মিলে স্কুলের ছোট্ট পুকুরটার কাছে-পিঠে ব্যাঙ যোগাড় করেছে। বাড়ীতে মাটির ভাঁড়ে জল দিয়ে এক-দুই দিন জিইয়ে রেখে জমিয়েছে। বেশ কয়েকটা ব্যাঙ জমা হ'লে চুপিচুপি স্কুলে এনে মেয়েদের জিনিষপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখে নিজেরা পিট্‌টান দিয়েছে। তাদের শাস্তির ভয় কি? ছেলে-স্কুলে তারা ভর্তি হবার জন্য তৈরি—স্কুল-বদ্‌লির ছাড়পত্রের জন্য এ স্কুলে আসা।

মিস্ বাসুর জেরায় মালী স্বীকার করলো যে, হ্যাঁ দুটি ছেলে যে ব্যাঙ ধরেছে, সে তা দেখেছে। কিন্তু বাবু লোক বলেছে

যে, তারা বাড়ীতে সাপ পুষেছে। তাই সাপকে খাওয়াতে তাদের ব্যাঙ দরকার।

তারপর থেকে ব্যাঙ-চালান দেওয়া স্কুলে ফ্যাসান হ'ল। কেউ কারুর ওপর চট্‌লেই পরের দিন দেখা যেত তার বইপত্রের সঙ্গে একটি ব্যাঙ। অনেকে বাড়ীর লোকদেরকে, পাড়ার মেয়ে-দেরকে, জব্দ করবার জন্য ব্যাঙ নিয়ে যেত বাড়ীতে! ক্রমে ক্রমে এই মারাত্মক অভ্যাস প্লেগের মত ছড়িয়ে পড়ল। ছুটি পাওয়া মাত্র দলে দলে মেয়েরা টুকরো-পুকুরের আশেপাশে ঘুরত ব্যাঙ ধরবার আশাতে।

মিস্ বাসু চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। ব্যাঙ ধ্বংস করতে তিনি তোড়-জোড় আরম্ভ করলেন। রোজ মালী ও দারোয়ান-দের তাঁর কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হ'ত, কয়টা ব্যাঙ মেরেছে তারা। সময়ে মরা ব্যাঙগুলো পর্যন্ত দেখাতে হ'ত। মেয়েদের তিনি ব্যাঙ ধরতে নিষেধ করলেন। তাতে ফল না হওয়াতে পুকুর-টুকুরের কাছে না যাওয়ার নোটিস্ বার করে দিলেন। কিন্তু তাতেও বন্ধ হ'ল না ব্যাঙ ধরা। কারণ মেয়েরা বুঝেছে, ব্যাঙ-চালানীতে যেমন শত্রুকে জব্দ করা চলে এমন আর কিছু-তেই নয়। চুপিচুপি ব্যাঙ-ধরা চলল। দেখা যেত, চোরের মত ধূর্ত-মুখে পা টিপেটিপে পুকুরপাড়ে মেয়েরা রুমাল হাতে ঘুরছে। খপ্ করে রুমাল ফেলে ব্যাঙ ধরবে। তাদের দেখলেই অন্য মেয়েরা চোখ টিপে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, "ব্যাঙ!" ওই একটি শব্দের অনেক অর্থ ছিল তখন। সে

ক্লাসের মেয়েরা তটস্থ হয়ে থাকত, তাদের ক্লাসে ব্যাঙ-ধরা! মানে, তাদের কারুরই হয়তো কপালে ব্যাঙ আছে। ব্যাঙ-ধরার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি মেটাতে সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠত। কোন কোন নীচ মেয়ে আবার ব্যাঙ-ধরাদের ধরিয়ে দিত মিস্ বাসুর কাছে। কঠিন শাস্তি পেত তারা। কিন্তু, তবু এ-নেশা যেন গোটা স্কুলকে পেয়ে বসল।

মিস্ বাসু অস্থির হয়ে উঠলেন। কোন জিনিস বন্ধ করার আদেশ দেবার পরেও যদি তা বন্ধ না হয়, তা'হলে তিনি হাল ছেড়ে দেন না। নিয়মকানুন আরও কড়া হ'ল দিনকের দিন। প্রথম শ্রেণীর বাছা মেয়েদের তিনি পালা করে পুকুর-প্রহরী করলেন। দেখা যেত শৈবলিনীদি, প্রীতিদি, লতিকাদি, (সেন) এঁরা পাহারায় ঘুরছেন। এদিকে মালী ও দারোয়ানদের কবুল করা হ'ল—মরা ব্যাঙ পিছু দু'পয়সা। মনে হয়, মিস্ বাসুর এই অদ্ভুত আইন থেকেই বোধ হয় বাংলা-সরকার গত প্লেগের সময়ে মরা ইঁদুরের ওপর বকশিশ কবুল করেছিলেন। যাই হোক স্কুল থেকে ধীরে ধীরে ব্যাঙ-চালানী চলে গেল।

এই সময়ে নন্দিনী স্কুল থেকে একটা-দুটো ব্যাঙ লুকিয়ে বাড়ী আনত। খুকু নীচু ক্লাসে পড়ত। সে ভীতু মেয়ে, নন্দিনীর মত ডানপিটে নয়। তাই কদাচিৎ এক-আধটু সাহায্য করে রাণীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সে বজায় রাখত। খুকুর একটি লম্বা রেশমের থলে ছিল, মাসী বুনে দিয়েছিল। নন্দিনী সেইটে ভয়ে ভয়ে ব্যাঙ আনত বাড়ীতে। আহা, রেশমী থলের কি

সুন্দর ব্যবহার! সেই ব্যাঙ রাণীদের জিনিসপত্রের মধ্যে বেরুত, আর লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেত। শেষে এই নিয়ে নানা গণ্ডগোল হওয়াতে রাণীরা বাড়ী ছেড়ে উঠে গেল। দেখ, তিল থেকে কি করে তাল গড়ায়! তোমরা কিন্তু ঝগড়া করবে না কারুর সঙ্গে। ঝগড়া হলেও মিটিয়ে নেবে, শত্রুতা রাখবে না। যদি কথা দাও, তা'হলে জন্মদিনে ফিরে আসি।

এ অনেকদিন আগের কথা। তৃতীয় শ্রেণীর নন্দিনী আর মারামারি করে না। থোপা থোপা ফুলনো চুল সে বেণীতে বাঁধে। ফ্রক পরে না। আজ তার জন্মদিন। মেঘাচ্ছন্ন বিকেলে একতালার রান্নাঘরে নন্দিনীর মা খাবার তৈরী করেছেন। চৌকাঠের বাইরে পিঁড়ি পেতে বসে নন্দিনী চোখে দেখছে। একখানা পিঠে চাখতে যেয়ে চোখ পড়লো মঞ্জুর দিকে—বাড়ী ঢুকছে, হাতে একটা বই। জন্মদিনের উপহার আনবার কথা শেষ মুহূর্ত্তে মনে হয়েছিল মঞ্জুর। কিন্তু কেনবার সময় ছিল না—নিজের অনেক বই-এর মধ্যে ক'খানা আনকোরা নতুন বইও ছিল। বেছে 'আষাঢ়ে গল্পখানা এনেছে মঞ্জু। আষাঢ় মাসে যখন জন্মদিন নন্দিনীর, তখন নিশ্চয় 'আষাঢ়ে গল্প' দেওয়া ঠিক হবে—এই বুদ্ধি এসেছিল মঞ্জুর। বইখানার দাম যে তখনকার দিনে মাত্র সাড়ে চার আনা, সে কথা একবারও মনে হয় নি ওর। টাকা-পয়সার মূল্য ছিল না মঞ্জুর জীবনে। সুন্দর জিনিস সে চাইত। বড়লোকদের ওইটুকুতেই লোভ ছিল তার, বড়লোকদের টাকাকড়িতে নয়।

আহারের আস্বাদনে নন্দিনী সব কিছু ভুলে বসেছিল। একান্ত অসময়ে মঞ্জুকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "এই যে মঞ্জু, কি মনে করে?" চট করে সুসজ্জিতা মঞ্জুর দিকে চেয়ে নন্দিনীর মনে পড়ে গেল আজ কোন্ দিন। তখন তাড়াতাড়ি মঞ্জুকে অতিথির সম্মান দিয়ে সে, "এস, এস" ব'লে মঞ্জুকে নিয়ে ওপরে গেল।

মঞ্জু একটু অপ্রতিভ হ'ল। 'বিকেল বেলাই যেয়ো ভাই, তাড়াতাড়ি।' এ কথা শুনে সে সত্যি-সত্যি তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। এখনও কেউ আসেনি, নন্দিনীর সাজগোজ হয়নি। সবে খাবার-দাবার তৈরি হচ্ছে। চিরকাল মঞ্জুর জীবনে এমনি ধান্না ঘটেছে। পাড়াগাঁয়ে মানুষ সে। কলকাতার সভ্য-সমাজের কায়দা বারে বারে ভুল বুঝেছে সে মুখের কথা মনের কথা বলে ভেবে নিয়েছে।

ঘরের মেজেতে ফরাস পাতা হয়েছিল। সেখানে মঞ্জুকে বসিয়ে, ধানু খোকনকে ডেকে নন্দিনা মুখ হাত সাবান দিয়ে ধুতে গেল। ছেলেবেলায় ডাকসাইটে মেয়ে থাকলেও মঞ্জু আজকাল অপরিচিত ছেলে দেখলে একটু কুণো হয়ে যেত। তবে ধানু ও খোকনের সঙ্গে দুটো একটা কথা কইতে-না কইতে খুকু এল। খুকু বাড়ীরই বাসিন্দা। কিন্তু, বিশেষ দিনে তো নেমন্তন্ন পেয়েছে। বেলা তিনটের সময় সে শাদা রেশমের জামা, ডুরে শাড়ী পরে প্রস্তুত ছিল। রেলিংএর পাশ থেকে এতক্ষণ সে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল এধারে। নেহাৎ একজন

অতিথিও এসে না পড়লে হ্যাংলার মত যাওয়া চলে না। এতো রোজকার ব্যাপার নয় যে লাফাতে লাফাতে যাবে সে। এ নন্দিনীর বিশেষ দিন, খুকুও যে আজ নিমন্ত্রিত অতিথি। তাই সারা দুপুর একবারও খুকু নন্দিনীদের অংশে আসেনি। জামা-কাপড় পরে ছট্‌ফট্‌ করছিল। এখন মঞ্জুকে আসতে দেখে বেঁচে গেল। পরম গম্ভীর মুখ করে খুকু ধীরে এসে ফরাসের একদিকে বসল মুরুব্বি চালে যেন ও এই প্রথম নন্দিনীর বাড়ী এল।

ধানু কলেজে ঢুকেছে সবে। কলেজের গর্বে সে গর্বিত। মুখে সব সময় কলেজের কথা। এমন কি সে ইংরেজীর অধ্যাপকের ব্যাখ্যানে আসর সরগম করে তুলল। লোভীর মত স্কুল-পড়ুয়ারা গল্প গিলতে লাগল। ভাবতে লাগল, কবে ওদের এমন ভাগ্য হবে? কলেজ! বাবাঃ, কবে কলেজে যাব? বিনা কারণে লোককে বলে বেড়াব: 'আমার কলেজের সময় হয়েছে'; 'কলেজের পড়া করতে হবে'; 'আমাদের কলেজে অমুক প্রফেসর পড়ান' ইত্যাদি।

নন্দিনী মুখ ধুয়ে ফিরে এল। পিঠ-ভরা কোঁকড়া, কালো চুলে চওড়া লাল ফিতের ফুল। লেস্‌-বসানো নীল সিল্কের জামা, কালো ঢাকাই শাড়ী। সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। গায়ে এসেন্সের গন্ধ, মা সাজিয়ে দিয়েছেন। আরতি আসতে পারলে ভালো হ'ত, নন্দিনী ভাবল। কিন্তু, আরতির বাবা যে ওকে সহজে বা'র হ'তে দেন না। তাই ক্লাসে-স্কুলে সব ব্যাপারে

এগিয়ে গেলেও বাইরের জগতে জমিয়ে নিতে আরতি পারত না। যখনই অচেনার সঙ্গে মুখোমুখী পড়ত সে, তখনি শামুকের মত খোলস গুটিয়ে নিজের ভেতর সরে যেত। স্কুলের প্রতিটি উদ্‌যোগে আগে চলে আরতি। প্রথমে চলে, নেত্রী যেন সে। আরতি সব জড়িয়ে কী-ই ভালো! নন্দিনীর জন্মদিনে এই ভালো আরতি নেই। চন্দ্রাকে বলেনি নন্দিনী। এক ক্লাসে পড়লেই বা? চন্দ্রা বড়লোক বলে শুধু নয়। চন্দ্রার মা চান না চন্দ্রা অন্তরঙ্গভাবে বাড়ী যায় সকলের। তাই ইচ্ছা ক'রে চন্দ্রাকে বলেনি নন্দিনী। রেণু ঘোষ অবশ্যই আসবে, রেণু ঘোষ নন্দিনীর সঙ্গে এক ডেস্কে বসে। স্কুলের ডেস্কগুলো দু'জনের বসবার মত। লম্বায় প্রায় দু'বন্ধু সমান। ব্যায়ামের ঘণ্টায় রেষারেষি চলে কে শেষে দাঁড়াবে লাইনের। সকলের শেষে লম্বাব জন্য দাঁড়ানোতেই বা গৌরব কত? ক্লাসের অন্য মেয়েরা নন্দিনীর বন্ধুত্বের দ্বিতীয় ধাপে আছে, প্রথম ধাপে নয়। রমলা অবশ্য বিশেষ বন্ধু, কিন্তু অসুখ হয়েছে ওর। দিদি কমলা উঁচু ক্লাসে পড়েন—মিষ্টি-গলায় বল্লেন, "ওর জ্বর হয়েছে। জন্মদিনে আসতে পারবে কি করে?" তাই তাদের কাউকে নেমন্তন্ন করা হয় নি। তবে, নন্দিনীর মাসী-পিসীর অভাব নেই। তাঁরা দল বেঁধে আসছেন।

ক্রমে ক্রমে অতিথিরা আসতে লাগলেন। নন্দিনীর মা-ও খাবার তৈরি শেষ করে কাপড় ছেড়ে এলেন। বাবা অফিস

থেকে ফিরে মায়ের হাতে নীল কাগজে জড়ানো একটা কি দিলেন। মা খুলে ফেললেন—একজোড়া সোনা-জড়ানো হাতীর দাঁতের রুলি। নন্দিনীর জন্মদিনে মা-বাবার উপহার। মা নন্দিনীর হাতে পরিয়ে দেখলেন। বল্লেন, "ঢলঢলে হচ্ছে, যেন সগ্গে উঠেছে।" মঞ্জু কথাটা শুনে অবাক হ'ল। তার পাড়াগেঁয়ে পিসী-মাসী-মামীর মুখে এ ধরণের ভাষা শুনেছে। নন্দিনীর শিক্ষিতা নাগরিকা মা-ও কি তা'হলে এ ধরণের কথা বলেন?

বেশ দামী জিনিষ ওঁরা দেন, না? মঞ্জু ভাবল। সেকালের রুলি-জোড়ার দাম ছিল আট থেকে দশটাকা মাত্র। নন্দিনী মা-বাবার এক মেয়ে। সমাজের যে স্তরে নন্দিনীর বাস, চিরকাল তারা বাইরের চাকচিক্যের দাম দেয়। ভাগের বাড়ীতে ঠাকুর চাকর বা টাকা পয়সা যথেষ্ট না থাকলেও, চট করে বাইরের পোষাকে অবস্থা ধরা যেত না। মঞ্জু সেকেলে হিন্দুবাড়ীর মেয়ে, তাতে পদ্মাপারের লোক। সত্যি, ওসব দেশের লোক রোজগারের চেষ্টায় শহরে এলেও, মনে প্রাণে শহুরে হ'তে পারেনি কখনও। আচার-আচরণে সেই বেমানানের দল ছিল মঞ্জুর পরিবার। নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য নিজে কখনও বেমানান না বনলেও, অন্য পরিবারের সঙ্গে নিজের লোকের যে কতটা প্রভেদ সেটা মঞ্জু সে-বয়সেই টের পেয়েছিল ভাল করে। দেশে তাদের পূজা-পার্বণ লেগেই আছে। সামান্য জমিদারীর আয়ে কুলোয় না, রোজগেরে ছেলে মঞ্জুর বাবাকে

নিয়মিত রোজগারের একটা অংশ পাঠাতে হয়। টাকা নেই অথচ দেশে নাম আছে। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন-অতিথি আসা সব সময় আছে। এলেই বড় মাছ, মাংস, সন্দেশের ধুম লেগে যায়। অতিথিরা যাবার সময়ে একটি করে চটের থলে অথবা ঝুড়ি ভর্তি করে উপহার নিয়ে যান—কলকাতার পাঁপড়, বেগুন, মূলো, কপি, নূতন আলু, কমলালেবু, শোন-পাঁপড়ি। বাক্সে দেওয়া হয় নূতন কাপড় কিনে। চিরদিনের নিয়ম চলেছে। খরচ মঞ্জুদের এ সব সংসারের চেয়ে বহুগুণ বেশী। অথচ নিজে-দের প্রতি পদে পদে বঞ্চিত করতে হ'ত। ভাল পোষাক-আষাক করা সম্ভব হ'ত না। মঞ্জুর বাবা কিনে দিতেন সাদা-মাঠা ভদ্র পোষাক। দামী জিনিস কেনা চলত না, অথচ খেলো বাবুয়ানারও তিনি বিরোধী ছিলেন। বন্ধুদের সৌখিন কিছু দেখলে বোকা মঞ্জু ভাবত, এরা বোধ হয় মস্ত বড়লোক। মঞ্জুর মা সৌখিন বা আধুনিক কোনটাই ছিলেন না। রেশম-লেস্-অর্গাণ্ডি-ভয়েল্ দিয়ে মেয়েকে সাজান তিনি বুঝতেন না। তা ছাড়া, আসল কথা, মঞ্জুর বাবা ছিলেন ঘোর স্বদেশী। এক টুকরো ও বিদেশী কাপড়ে তাঁর ছেলেমেয়ে সাজতে পারবে না— আদেশ জারী হয়েছিল। তাই বোধ হয় চিরকাল ওই ধরণের বিদেশী সৌখিনতায় মঞ্জুর লোভ ছিল—যা সে পায় নি। নন্দিনীর সিল্কের জামাটা দেখতে লাগল মঞ্জু পিঠে হাত বুলিয়ে। বিলেতী রেশম—কি মসৃণ! রেণু ঘোষ এসে গিয়েছিল। ওর ছাপা জর্জেটের শাড়ীর দিকে বার বার তাকিয়ে

দেখল মঞ্জু। রেণু ঘোষ উপহার এনেছে একশিশি এসেন্স, একখানা রুমাল। কি চমৎকার! মঞ্জু ভাবল, আমি একটা বিশ্রী বই এনেছি কেন? আমার মত ঘরের কোণে মুখ গুঁজে বই পড়তে তো কেউ ভালোবাসে না। মাকে বললে ঠিক মা কোন যোগ্য উপহার কিনে দিতেন। মা-ই বা কি রকম! কোন কাণ্ড-জ্ঞান নেই। ওঁরই তো বলে দেওয়া উচিত ছিল, কি দিতে হয়। জীবনে প্রথম আবছা বুঝলো মঞ্জু, ওর মা গেঁয়ো মানুষ, ধারালো নন। নন্দিনীর চশমা-চটি-পরা, ইংরেজী বলা মায়ের কাছে তার মা!—সন্ধ্যেতে টবের তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে মাথা ঠোকেন খালি পায়ে চওড়া আলতা পরেন, ইংরেজী এক অক্ষর বোঝেন না। হঠাৎ মায়ের ওপর একটা অদ্ভুত সহানুভূতিতে মঞ্জু ভরে উঠল। আহা, কোথাও বেড়াতে যান না; কদাচিৎ ঘোড়ার গাড়ী বা ট্যাক্সি ভাড়া করে বেড়ান হয়। ট্রামে-বাসে ওঠার রেওয়াজ নেই। বেড়াতে নিয়ে যাবার সময় পান না বাবা। 'অসহযোগ আন্দোলনে' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের দলে বাবা আদালত ছেড়েচেন। উকীলের বিদেশী পোষাক আগুনে পুড়িয়ে, তিনি স্বাধীন ব্যবসা ধরেছেন। ইংরেজ সরকারের চাকরিও তিনি করবেন না। ভালো ভালো চাকরি পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। সেকালের ডেপুটির নামডাক ছিল। তবু মঞ্জুর বাবা ডেপুটি-গিরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। গোলামীতে রুচি নেই তাঁর। মূলধন নেই, ছোটখাটো ব্যবসা নিয়ে সর্বদা ছোটাছুটি করতে হয়। সময় পান না হাতে, টাকার চিন্তা

লেগে থাকে। মনে বাড়ীতে ছোট দুই ভাই-এর পড়ানো, ভরণ-পোষণও চালাতে হয় এই আয়ের মধ্যে থেকে। আচ্ছা, এরা কি তার বাবার মতামত বুঝবে? ওদের বাবারা কি রকম সাহেবী অফিসে কাজ করেন, সাহেব সেজে বেড়ান! সে-ই ভালো। রাতারাতি মঞ্জুর বাবা খদ্দর ধরেছেন। কিন্তু স্যুটেই মানাত ওঁকে, না? এ সব কি ভালো? এই যে, তারও গায়ে মোটা খদ্দরের জামা, দেশী মিলের ফ্যাকাশে রঙ-এর চট্‌চটে শাড়ী। তখন দেশী কাপড়ের জলুস ছিল না। এ-সাজে তাকে কি করে ভালো দেখাবে? সে একেই ত' ভাল দেখতে নয়। তা হোক, তবু খদ্দর ভালো, দেশী জিনিসই ভালো। বিদেশী জিনিস সুন্দর হ'লেও পরের জিনিস। যেমন মঞ্জুর মা-ই ভালো। নন্দিনীর মায়ের সঙ্গে সে আপন মাকে বদলাতে চায় না। এই সমাজে এলে তার মা জল-ছাড়া মাছের মত খাবি খেতেন নিশ্চয়। তা হোক, সে মাকে নিয়ে তা'হলে ঘরের কোণে বসে থাকবে।

উপহারে উপহারে নন্দিনীর পড়ার টেবিল ভ'রে উঠল। মঞ্জু অবাক হয়ে দেখতে লাগল। কত রকমের যে জিনিস! জামার কাপড়ে মস্ত মস্ত-গোলপী ফুল তোলা। পুতুলের চায়ের সরঞ্জাম। কী চমৎকার পেয়ালা-পিরাচগুলো! দেখলেই খেলা করতে ইচ্ছা হয়। চুলের চওড়া রেশমী ফিতে, প্রকাণ্ড ক্লিপ্। পাউডারের গাটাপার্চার কোটো। সাপ-মই খেলা, খুকু দিয়েছে। আধ হাত চওড়া লেস-বসানো পেটিকোট, গলার পাথরের মালা। এদের পাশে মঞ্জুর উপহার কত তুচ্ছ? বই মাত্র আর

একজন দিয়েছে, সে ধান্নু। সে বইও ঝক্‌ঝকে ছাপা, তক্‌তকে বাঁধা, 'গ্রিম্‌স্‌ ফেয়্যারি টেল্‌স্‌'। মঞ্জুর ইচ্ছা হ'ল নিজের সামান্য উপহারটুকু তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়।

কি মজা নন্দিনীর? এত সব সুন্দর জিনিস একদিনে পেল! কেন যে মঞ্জুর জন্মদিন হয় না।

গান-নাচ-হাস্যকৌতুক হ'ল। নন্দিনী গান গাইল, তারপর কাঁচের থালায় জলযোগ। তারপরে বাড়ী ফেরা। তারপরেও আছে—ঘুম, স্বপ্ন। ওইসব জিনিস মঞ্জুকে সবাই দিচ্ছে। মঞ্জুর নিজের জন্মদিন—বন্ধু নন্দিনীর নয়।

দশ

তৃতীয় শ্রেণী সবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। মিস্‌ বাসু নূতনভাবে স্কুলে সাজাচ্ছেন। পুস্তকাগারটা একতলা থেকে দোতালায় তুলে এনেছেন। লম্বা টেবিল মধ্যে সাজিয়ে, ছোট ছোট আলমারী কিনে, বেশ গোছানো হয়েছে ঘরটি। পড়ার ঘণ্টার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েরা বসে পড়াশোনা করতে পারবে সেখানে। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা শুধু আসতে পারত, অবশ্য বই বাড়ী নিয়ে যেতে পারত সবাই। কার্ড দিয়ে বই দেবার নিয়ম ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর পড়বার উপযুক্ত বই সেই শ্রেণীর নাম আঁটা আলমারীতে থাকে। মঞ্জুর ওপর লাইব্রেরী দেখাশোনা

ভার ছিল। বেশীরভাগ বই ছিল ইংরেজী ভাষায়। তখনকার শিক্ষা আসত ইংরেজীর মাধ্যমে। যাতে মেয়েরা তাই ভালভাবে ভাষাটা শিখতে পায় মিস্ বাসু সেই চেষ্টা করতেন। ক'দিন নিয়ম করেছিলেন স্কুলে কোন সময় কারুর সঙ্গে কেউ বাংলাতে কথা বলতে পাবে না, ইংরেজীতে বলতে হ'বে। ফলে সে ক'দিন কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। গোলমাল করার বা ক্লাসে কথা বলার শাস্তি কাউকেই নিতে হ'ল না। কয়েকটি মেয়ে শুধু বিদেশী ভাষা বলবার অগ্নি-পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করলো। চন্দ্রা, মঞ্জু, আরতি তাদের মধ্যে ছিল।

মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে ভারী গর্বিত। প্রবেশিকার বই ধরানো হয়েছে ওদের, দু'বছর বাদে পাশ করে কলেজে যাবে। মিস্ দত্তের ঘণ্টা কমে গেছে; নেই বল্লেই হয়। মিস্ বাসুই এখন বেশী করে পড়াচ্ছেন। পরীক্ষার বই ধরলেও বাইরের পড়া বন্ধ হয়নি। 'The Golden Treasury' নামে একখানা ইংরেজী ছোটদের মাসিক প্রত্যেক মেয়েকে নিতে হ'ত। সে পত্রিকা আবার ঠিক মত পড়া হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে মাঝে মাঝে মিস্ বাসু পত্রিকাখানা থেকে ক্লাসে লিখতে দিতেন। 'Science and Discoveries' বলে দুটো পাতা থাকত তাতে। তার থেকেই বেশী প্রশ্ন আসত, যেমন সিন্‌থেটিক হীরা কি? সেক্সপীয়ারের নাটক থেকে বাছা অংশ পড়ে শোনাতেন ও বুঝিয়ে দিতেন মিস্ বাসু। গল্পচ্ছলে নানা দেশের কথা বলতেন। এই সময়ে প্রত্যেক শুক্রবারে বিভিন্ন

শ্রেণীর মেয়েরা অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে স্কুলের অন্য মেয়েদের দেখাত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েরা নূতন ধরনের অভিনয় করেছিল—ভৌগোলিক অভিনয়।

পৃথিবী কেমন করে সূর্যের চারিধারে ঘোরে তারা সেটি চমৎকার দেখিয়েছিল। বীণা গুহ সূর্য সেজেছিল। পিচবোর্ডের সোনালী রঙ-করা মুকুট পরে সূর্যের সাজে কাপড় ঢাকা উঁচু টুলে বসেছিল। কালো কোঁকড়া চুল, বড় চোখ, লাল টকটকে মুখে তাকে সূর্য মানিয়েছিল বেশ। লম্বা চেহারার রেণু ঘোষ পৃথিবীর শ্যামল সাজে সূর্যের চার পাশে ঘুরে ঘুরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছিল। নৃত্যের ছন্দ বাজছিল, এক, দুই, তিন, ঘোরা। রাত্রি বিদায় নিচ্ছে করুণ নৃত্যে, অন্য পাশ থেকে উষা আনন্দে চলে আসছে। ছয় ঋতু আলাদা আলাদা সাজে আসা-যাওয়া করছে। যেমন সুন্দর পরিকল্পনা তেমনি সুন্দর নাচের মধ্যে দিয়ে অভিনয়। সকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠান দেখে অবাক। সেইবার পুরস্কার বিতরণের সময়ে এই পরিকল্পনাটি একটু বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। তবে, এ নিয়ে সামান্য একটু মনকষাকষি লেগে গেল।

ধারণাটা মাথায় প্রথমে এসেছিল মঞ্জুর। রাত্রি-দিনের নৃত্য, ঋতুদের আসা-যাওয়া ইত্যাদি। পরে আরতি এর সঙ্গে ডালাপালা যোগ দিয়েছিল, যেমন পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ। মিস বাসু যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের কাছে কে এই নূতন পরিকল্পনাটি করেছে জানতে চাইলেন, তখন নন্দিনী তাড়াতাড়ি

বলে উঠলো, "আরতি, আরতি!" আরতিও স্বীকার করল। মিস্ বাসু প্রশংসা করলেন তার। বেচারী মঞ্জুর নামটা উঠল না পর্যন্ত।

সেদিন থেকে অনেকদিন পর্যন্ত মঞ্জু আরতির সঙ্গে কথা বলেনি। কেন? প্রশংসা চেয়েছিল মঞ্জু, তা পায়নি বলে? নন্দিনীর ওপরে তো রাগ হওয়া উচিত ছিল তার। নন্দিনীই তো নাম বলেনি। ক্লাসের মেয়েদের ওপর বা রাগ হ'ল না কেন? তারা চুপ করে রইল তো? কিন্তু, শুধু আরতির সঙ্গে কথা বন্ধ করল মঞ্জু। কেন আরতি একা গৌরব নেবার ইচ্ছা করে মঞ্জুর নাম বলেনি? কেন আরতি সামান্য যশের লোভ সামলাতে পারল না? এতে মঞ্জুর ক্ষতি হ'ল না, হ'ল আরতির, সে এত ভাল ছিল। সামান্য নামটুকুর মোহ মঞ্জু চায় না। কিন্তু আরতিকে মঞ্জু সাধারণ মেয়ের কত ওপরে ভাবত। এই আরতির সঙ্গে মঞ্জু নদীর ধারে কাঠের ঘরে ষ্টুডিও বেঁধে থাকবে!

মনান্তর চলল কিছুদিন। কিন্তু, মনে মনে দু'জনেই ব্যগ্র ছিল ভাব করতে। সুতরাং মিটে গেল একদিন। হঠাৎ আবার চন্দ্রার সঙ্গে বাধল মঞ্জুর। মঞ্জুর রূঢ় কথায় চন্দ্রা কেঁদে ফেলল। বাড়ী ফিরে মন খারাপ করে চোস্ত ইংরেজীতে মঞ্জু ক্ষমা চেয়ে চাকরের হাতে চন্দ্রাকে চিঠি পাঠিয়ে দিল। চন্দ্রাও তেমনি আন্তরিক উত্তর পাঠাল। ঝগড়া মিটল।

কখন-সখন এ রকম ছোটখাটো ঝগড়া বা মনান্তর হলেও মোটের ওপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন বিরোধ ছিল না। অত্যন্ত একতাবদ্ধ ছিল তারা। তাই বোধ হয়, অন্য অন্য শ্রেণীর মেয়েদের চেয়ে সব বিষয়ে এত উৎকর্ষ তারা দেখাতে পেরেছিল। বিশেষ করে একটি দোষ ছিল না তাদের। প্রায় সব স্কুলেই এক শ্রেণীর মেয়ে আছে, যারা শিক্ষয়িত্রীদের অনুগ্রহ পাবার জন্য তাঁদের মোসাহেব সাজে, মেয়েদের শত্রুতা করে। মঞ্জুরা সর্বদা নিজেদের দল বেঁধে অতগুলি মেয়ে একত্রিত থাকত, শিক্ষয়িত্রীদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে যেত না। একতার জন্য সকলে তাদের ভয় করে চলত। তারা শ্রেষ্ঠ ছিল স্কুলটিতে, অনেকে হিংসা করত তাদের। যখন তারা প্রথম শ্রেণীতে ওঠে, তখন অন্য শ্রেণীর মেয়েরা শিক্ষয়িত্রীদের কাছে ক্রমাগত লাগিয়ে লাগিয়ে তাদের অপ্রিয় করে তোলে। এক বার মজা করবার জন্য মঞ্জুরা তখনকার চল্‌তি আধুনিক মাসিকের একটা গল্প সকলে মিলে মাঠে বসে ভেডিয়ে পড়েছিল। এসব গল্প অত্যন্ত খারাপ, পড়া বা ছাপানো উচিত নয়, মত প্রকাশ করে তারা ক্ষ্যান্ত দিল। একথা অন্য মেয়েদের চক্রান্তে শিক্ষয়িত্রীদের কানে উঠলো যে, নিউ ম্যাট্রিকের মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে বড়দের জঘন্য গল্প-উপন্যাস পড়ে ব'খে যাচ্ছে। এইভাবে নানা তিল অভিযোগ তাল হয়ে কানে যেত। তারা ব'খে যাচ্ছে এ বিশ্বাস শিক্ষয়িত্রীরা পোষণ করছেন জেনেও তারা অভিমানে চুপ করে দূরে দূরে সরে থাকত। অত্যন্ত

দুষ্ট, দুর্দান্ত মেয়ে তারা, সবাই যদি এই ধারণা মনে গেঁথে রাখে তাই থাক ; তারা জানে তারা ভাল, ভালই চিরদিন থাকবে। এতকাল দেখার পরে নূতন করে জানান দেবার প্রবৃত্তি হ'ল না তাদের। সুতরাং শেষ স্কুলের দিন কটাতে যেন একটু কালোছায়া পড়েছিল। অবশ্য সাময়িক।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। 'ঝগড়াটী' নাম লজ্জার বিষয় বলে মেয়েরা মনে করত। একবার এক মেয়ে আর একজন মেয়েকে (জাতিতে ব্রাহ্মণ) 'ঝগড়াটি-বামণী' বলাতে বৈঠক বসে গেল বিচারের। মেয়ে পঞ্চায়েতে স্থির হ'ল মাপ চাইতে হবে। আসলে বেচারার অপরাধ নেই। সে 'হিন্দুস্থানী উপকথা' বইখানার 'ঝগড়াটী-বামণী' ছবি দেখে ওকথাটা বলেছিল মাত্র। ভাল ভাল বই সকলে একসঙ্গে পড়ত, একজন পরে এসে গল্প শোনাত অন্যদের। আমেরিকার লেখিকা 'অলকাটের' লেখা বইগুলো খুব প্রিয় ছিল। প্রিয়ম্বদা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, সুকুমার রায়, কুলদারঞ্জন রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এঁদের লেখা বাংলা শিশুপাঠ্য বই-এর যথেষ্ট আদর ছিল। বড়দের বই বেছে বেছে প্রথম শ্রেণীর মেয়েরা পড়তে পেত। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের বই বাংলা শেখার উদ্দেশে তাদের হাতে আসতো। মহিলা-সাহিত্যিকাদের মধ্যে অনুরূপা-ইন্দিরা-নিরুপমা-গিরিবালা দেবীর লেখার চল ছিল। বিশেষতঃ গিরিবালা দেবী সরস্বতীর মেয়ে ও-স্কুলে পড়তো তখন। পড়াশোনার তালে সমানে

চলত খেলা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খেলার চল্‌তি ছিল। কিছুদিন চলল ঘুঁটি খেলা। ঠকাঠক, ঠকাঠক শব্দে বারান্দা, মাঠ জুড়ে গোল হয়ে বসে মেয়েরা ঘুঁটি খেলছে। ছোট ঘুঁটি, বড় ঘুঁটি। দু'হাতে, একহাতে। যার যত ঘুঁটি সঞ্চয় থাকবে সে তত মানী লোক। ঘুঁটি খেলত সব চেয়ে ভালো গৌরী, মিনতি, সুহাসিনী। মঞ্জুকে মামাবাড়ীর পাশের বাড়ীর রেণুদি গিরিডি থেকে এক সেট্ ধব্‌ধবে শাদা পাথরের পাঁচ ঘুঁটি এনে দিয়েছিলেন। গয়না পেলে মা-দের যত আনন্দ হয়, মঞ্জুর তার থেকেও বেশী আনন্দ হয়েছিল। হাত শক্ত হ'বার ভয়ে চন্দ্রা খেলত না, আরতি এ খেলা বিশেষ পছন্দ করত না। নন্দিনীও জমাতে পারেনি এ খেলা। স্কিপ্ খেলার নেশা কিছুদিন দেখা গিয়েছিল। মাঠে বিরাট লম্বা দড়ি দু'ধার থেকে ঘোরানো হচ্ছে। দলে দলে মেয়েরা লাফিয়ে ঢুকে দড়ি ঘোরানোর ফাঁকে ফাঁকে লাফাচ্ছে। লতাপাতা কেটে স্কিপ করছে, অর্থাৎ জায়গা বদল করছে দড়ি ঘোরানোর মধ্যেই। কে কতবার একসঙ্গে দড়ি-লাফাতে পারে—প্রতিযোগিতা চলত। তাড়াতাড়ি লাফানোর একটা ছড়া ছিল: "সল্ট-পিপার-মাষ্টার্ড-চিলি—" 'চিলি' বা লঙ্কা কথাটি বলবার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ঘোরানো জোর চলত—গরম তেলে লঙ্কার মত চিড়্‌বিড়্ করে মেয়েরা লাফাত।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে মেয়েদের এ দুই খেলার নেশা আর ছিল না। সেই মত 'হা-ডু-ডু', 'চোর-চোর', 'বুড়ি-বুড়ি' খেলার চালও উঠে গিয়েছিল। ব্যাডমিণ্টন, ভলি, ডেক্-টেনিস,

বাস্কেট্-বল খেলা আমদানী হয়েছিল। মঞ্জুরা সব থেকে পছন্দ করত বাস্কেট্-বল। স্কুলে সব চেয়ে ভাল বাস্কেট্-বল খেলতো তারা। নিজেদের একটি দলও ছিল। সারা স্কুলের হয়ে সেই দল খেলত। নানা স্কুলকে প্রতিযোগিতায় ডাকত—পাশ্চাত্ত্য স্কুলগুলোও হেরে যেত। মিনতি সেণ্টার ফরোয়ার্ড; সেণ্টার নন্দিনী ও নীলিমা; ব্যাক রেণুকা লাহিড়ী ও রেণু ঘোষ; গার্ড মঞ্জু। বাস্কেট্ম্যান্ কখনও আরতি, কখনও গৌরী। মিস বাস্থ রেফ্রি হতেন। খেলাটা মঞ্জুদের শক্ত নেশা হয়ে গিয়েছিল। একটু ছুটি পেলেই মাঠে দৌড়ত। মিস বাস্থকে ডাকা মাত্র তিনি আসতেন। কখনও আপত্তি করতেন না। 'এখন পারব না'—বলতেন না। উঁচু হিলের ওপর ছুটে ছুটে সারা খেলার ছকে ঘুরতেন বাঁশী গলায় ঝুলিয়ে। কারুর ভাল খেলা দেখলেই 'That's, good' বলে বাহবা দিতেন।

খেলাধূলা অথবা বাৎসরিক স্পোর্টেও ঘটা হ'ত। স্কুলের মাঠ দৌড়ের পক্ষে ছোট ছিল। তাই 'মূক-বধির' শিক্ষালয়ের মাঠে বা পাশের 'পর্দা-পার্কে' স্পোর্টস্ করা হ'ত। নেমন্তন্নের চিঠি পেয়ে অভিভাবক ও বাচ্চা-বাচ্চা লোকজন আসতেন মেয়েদের খেলাধূলা দেখতে। খেলার শেষে তখন-তখন পুরস্কার দিয়ে দেওয়া হ'ত। মিনতি-গৌরী-নন্দিনী-রেণুকা এদের একচেটে পালা ছিল প্রাইজ পাবার। চন্দ্রা-নীলিমা-আরতিও স্পোর্টে ভাল ফল করত। বেচারী মঞ্জু এখানে

গোবরনাদা। খেলাধূলায় যথেষ্ট উৎসাহ ছিল তার, সব রকম খেলাও পারত সে মন্দ নয়। কিন্তু, স্পোর্টে এঁটে উঠতে পারত না ও অন্য মেয়েদের সঙ্গে। সবটাতে নাম দিয়ে অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। রোগা-ছোট্ট মেয়েটাকে আবার শুভার্থিনী শিক্ষয়িত্রীরা কঠিন খেলায়, যেমন 'অব্‌ষ্ট্রাক্‌ল্‌ রেস্‌', 'হার্ডল রেসে' নাম দিতে দিতেন না। স্পোর্টের দিনে মঞ্জুর ছোটাছুটিই সার হত', একটি পুরস্কারও পেত না।

মেয়েদের চৌকস করে, তুলবার আশায় মিস বাসু অনেক কাজ শেখাচ্ছিলেন। বলছি।

কাদা দিয়ে গড়া বা ক্লে-মডেল ও ড্রইং-মাস্টার মশাই-এর ছবি আঁকার নিয়মিত ক্লাস বসত। তা ছাড়া বেতের বোনা শেখাবার জন্য শনিবার সকালে স্কুলে একজন অন্ধ মাস্টারমশাই আসতেন। ছুটির দিন, তবু সকালে স্কুলের গাড়ী বার হ'ত। যার যার ইচ্ছা সে আসত। মঞ্জু আসতো শিখতে। বেশ লাগতো ফেরবার সময়ে তার। গাড়ীতে ছন্নছাড়া পথে পথে দুপুরে ঘুরে মেয়ে নামাতে নামাতে অনেক বেলায় বাড়ী ফিরত ও। ভরা-দুপুরে কলকাতার যে একটা উদাস-করা রূপ আছে, এ আবিষ্কার মঞ্জু সে সময়ে করল। বিবর্ণ গাছ থেকে দু'একটা শুকনো পাতা খ'সে পড়ছে। হু-হু করে ধূলো উড়িয়ে গরম বাতাস পীচের রাস্তার বুকে বয়ে যাচ্ছে সাড়া জাগিয়ে। ইঁটের বাড়ীতে, বাঁধা রাস্তার ভিড়ে কলকাতার আত্মা হাঁপিয়ে উঠে যেন বলতে চায়: 'আমি আর পারি না।

খোলা আকাশের নীলে, সবুজ মাঠের কোলে আমাকে মুক্তি দাও। শহরের বাঁধা-ধরা ছকে গেঁথে ফেলেছ আমাকে, একদিন যার বুকে গভীর বন ছিল, অন্ধকারে শেয়াল ডাকতো, কুল-কুল ধারায় গঙ্গা বয়ে যেত, এখনকার মত পচা-ঘোলা ডোবা ছিল না আমার গঙ্গা, যাতে, মঞ্জু তুমি, কদাচিৎ দিদিমা-ঠাকুরমার সঙ্গে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে স্নান করতে যাও, কপালে গৌরমাটি-চন্দনের ঠাণ্ডা ছাপ পরে এস। দাওনা বাড়ীঘর ভেঙ্গেচুরে ফেলে। বয়ে যাক কলকাতার গঙ্গা পাগল-করা স্রোতে। সব ডুবে যাক। মঞ্জু, বাঁশী নিয়ে বোস তার কূলে।

এমন পাগলামির কথা মনে এলেও কখন কাউকে কিছু বলত না মঞ্জু, চুপচাপ গাড়ীর কোণে বসে বাইরে চেয়ে থাকত। শিক্ষয়িত্রীরা সখ করে ঘুরতে বাসে আসতেন। করুণাদি, তৃপ্তিদি, রাণীদি যেতেন প্রায়ই। কালুদিও যেতেন। এঁরা চারজনে খুব বন্ধু ছিলন। শেষে করুণাদি এ জীবনের পার থেকে চলে যাবার পরে তৃপ্তিদি, কালুদি, রাণীদি সর্বদা একসঙ্গে থাকতেন। ওঁদের নাম সেক্রেটারী বি, এম, বোস মশাই দিয়েছিলেন, 'থ্রি মাসকেটিয়স'। বোর্ডিং-এ থাকতেন তিনবন্ধু। চমৎকার সহজ জীবন। কালুদি পরে বিয়ে করেন। তাঁর মেয়ে বাবুলও থাকত বোর্ডিংএ—পড়ত স্কুলে। ছিপছিপে সুন্দর মেয়ে। মঞ্জুর বিস্ময় বোধ হ'তো অনেক দিন পরে যখন দেখা হ'ল। সেই কালুদি! আজ মা হয়েছেন!

অন্ধ মাস্টারমশাই পায়ের শব্দ শুনে বলে দিতেন কে এল। সর্বদা হাসিমুখ, কখনও বকতেন না। নিজের মন্দভাগ্যকে হাসিমুখে বইবার শক্তি ছিল তাঁর, তাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত সকলে। হা-হুতাশে ঘরের কোণে বসে না থেকে যেটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে কাজ করে যাওয়া—অদৃষ্টকে এ-ভাবে নূতন করে গড়ে নেওয়া যায়। মঞ্জু এক প্যাটার্ণের ফুলের ঝুড়ি বুনতে ভুল করে আর এক কিম্ভূত প্যাটার্ণ বুনে ফেল্ল, তখন মাষ্টারমশাই হেসে বল্লেন, "বাঃ মঞ্জু, বেশ তো মাথা তোমার। নূতন প্যাটার্ণ বার করে ফেললে।"

সেই কিম্ভূত ঝুড়ি মঞ্জু মিস্ বাসুকে উপহার দিয়েছিল মস্ত কাজ করেছে ভেবে। তাঁর কাছে মেয়েদের হাতের কাজকর্ম জমা হ'ত—সেলাই, বোনা, ছবি, মূর্তি। যত্ন করে সাজিয়ে রাখতেন তিনি সামান্য জিনিসগুলো। ছোট ছোট প্রদর্শনী করে দেখাতেন। স্কুলে নানা বিশিষ্ট অভ্যাগতের ক্রমাগত যাওয়া-আসা লেগে ছিল। ভিন্ন দেশীয়রা স্কুল দেখতে আসতেন প্রায়ই। ধৈর্যের অভাবে এক হাতের কাজের মধ্যে ওই ঝুড়িটি ছাড়া মঞ্জুর কোন দান ছিল না। অবশ্য মেয়েদের হাতের কাজের ছোট প্রদর্শনীতে মঞ্জুর কিম্ভূত ঝুড়ি স্থান পেয়েছিল। তবে দু'দিক দু'প্যাটার্ণের ব'লে তাকে দেয়ালে ঠেসিয়ে রাখতে হয়েছিল। মঞ্জুদের হাতে লেখা 'আলো পত্রিকা'ও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল।

সেলাই-এর ঘণ্টা। ভাবতেই মঞ্জু-আরতির চোখে জল।

চিরকালের চঞ্চল মঞ্জু, ছটফটে স্বভাবের। হাতের কাজ ওর ভাল হবে কি করে? সেলাই-বোনা এসবে ধৈর্য বা মাথা কোনটাই ছিল না ওর। বছরের প্রথমে নূতন সেলাই ধরবার সময়ে যে উৎসাহ দেখা যেত বছরের শেষে তা থাকত না। একবার উলে-বোনা চটের ব্যাগ শেখানো হচ্ছিল। বই দেখে নক্সা বেছে যে যার মত চটের ওপর তুলছিল। এক শেয়ালের ছবি তুলবে ঠিক করল মঞ্জু। 'ল্যাজে কিন্তু অনেক উল লাগবে,' শিক্ষয়িত্রীকে সে জানাল। শিক্ষয়িত্রী আশ্বাস দিলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, মোটা ল্যাজ দূরের কথা মুড়োটির পর্যন্ত দেখা নেই। গোটা বছর কেটেছে মঞ্জুর চারধারে বর্ডার তুলতে। ছবি সুন্দর আঁকত আরতি। কিন্তু সেলায়ের হাত অসম্ভব খারাপ ছিল তার। আশ্চর্য! বারে বারে মাথা নিচু করে চশমার কাঁচ মুছে সেলায়ে ফোঁড় তুলছে, আবার ভুল সেলাই একটি একটি করে খুলছে। হাত ক্রমাগত রুমাল বা কাপড়ে মুছবার কামাই নেই। তবু কি নোংরা হ'ত ওর সেলাই! অথচ পরম গম্ভীর মুখে আরতি সেলাই করে যেত ফাঁকি না দিয়ে, যেন সেলাই ওর জীবন-মরণ।

লাঠি ছোরা শিখত মেয়েরা। 'অনুশীলন সমিতির' পুলিন দাস একটা স্বদেশী আন্দোলনের পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। টিফিনের সময় তিনি এসে শেখাতেন। প্রাইজ বা কোন উপলক্ষে মেয়েরা ছোট লাঠি, বড় লাঠি, ছোরা খেলা দেখাতো। 'তামেচা, বাহড়া, শির, কটী ইত্যাদি প্যাঁচের

নাম মুখে মুখে ফিরত। পুলিন দাসের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ভাবত মঞ্জু, এই লোক, যিনি নেহাৎ সাধারণ লোকের মত তাদের খেলা শেখাচ্ছেন, ভুল শুধরে দিচ্ছেন, স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি কত দুঃসাহসিক কাজ করেছেন! মঞ্জুর আনাড়ি হাতে বড় লাঠিটা ঠকাস্ করে যাঁর টাকে পড়ে গেল, যিনি একটি কথাও বল্লেন না, তিনি কত বড় বীর!

মাঝে মাঝে মেয়েদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের (Physical Demonstration) প্রদর্শনী লোক ডেকে দেখান হ'ত। নানা রংঙের শাড়ীর ফ্যান্সি পোষাকে, ব্যাণ্ডের সুরে মেয়েরা কুচকাওয়াজ করে স্কুলের নামের আদ্যক্ষর তৈরি করত। কখন Breathing Exercise অর্থাৎ নাচের ভঙ্গিতে নিঃশ্বাসের ব্যায়াম দেখানো হ'ত। এটা শেখাতেন মিস্ অর্নশল্ড। মঞ্জু এ গুলোতে থাকত। কিন্তু, নাচের ব্যায়ামে-সর্বশরীরে ফুলের গয়না পরে পিয়ানোর সুরে লোকজনের সম্মুখে হাত-পা নাড়তে মাথা কাটা যেত তার। নানা দোষ ছিল মঞ্জুর। গানের স্কুলে গান শিখলেও কখন লোকের সামনে লজ্জায় গান গাইত না সে। ফলে কেউ জানত না সে গান ভালই গাইতে পারে। শুধু কোরাস গানে যোগ দিত সে। তখন স্কুলটার গানে নাম ছিল। গোপেশ্বর বাবুর ভাই সুরেনবাবু গান শেখাতেন। অন্য স্কুলের সঙ্গে গানের প্রতিযোগিতায় এ-স্কুল যোগ দিত ও প্রায় প্রতিবারই কাপ পেত। গানের গলা বিশেষ ভাল না থাকলেও সুর ও তালবোধের জন্য চন্দ্রা বহুবার

গানের পরীক্ষায় ক্লাসে প্রথম হ'ত। রেণু ঘোষও একবার প্রথম হয়, গৌরীও হ'ত এক আধবার। গানের মত মেয়েরা ড্রিল প্রতিযোগিতায় অন্য স্কুলের সঙ্গে ইনটার-স্কুল-ড্রিলে যোগ দিত। ব্যায়াম বা ড্রিল কিসিদি শেখাতেন,—কখন বা ইংরেজ মহিলা কেউ। কিসিদি ঝরঝরে পরিষ্কার মানুষ। হঠাৎ চটে উঠতেন, কিন্তু মেয়েদের ভালবাসতেন। নীলিমাকে ক্ষ্যাপাত সবাই কিসিদির প্রিয়পাত্রী বলে। মধ্যে মজার মজার ক্লাস হ'ত—যেমন রান্নার ক্লাস। সে দিনটির অপেক্ষায় সবাই পথ চেয়ে থাকতো। একটা কিছু ভাল খাবার রান্না হ'বে, শেষে খাওয়া। মাংস, কইমাছের পাতুরী এগুলো রান্নাতে ভারী মজা। সোমবার শেষ ঘণ্টায় বোর্ডিংএ রান্না শেখানো হ'ত। সারাদিনের ক্ষিধের জ্বালা একটু কমবে আশাতে সবাইকার সোমবার দিন মন ভাল। এক সঙ্গে ফুর্তি করে ভাল জিনিস রান্না, খাওয়া, সে কি কম মজা? একবার মিনতি, গৌরী, নীলিমা, দুষ্টুমি করে চুপিচুপি সকলের ভাগ সাবাড় করে দিয়েছিল। সেদিন কি দুঃখ, কি রাগ!

স্কুলের নাচগানে মঞ্জুর সুবিধা হ'ত না। গানের মত নাচও সে বাড়ীতে চুপিচুপি অভ্যাস করলেও স্কুলে কারুর সামনে দেখাবার কথা ভাবতে পারত না। চেহারাও অবশ্য ভাল—নাচের উপযোগী—ছিল না। অভিনয়ে ছেলের ভূমিকা নিত মঞ্জু। ঐক্যতানিক বাদ্যে এস্রাজ বাজাত, আবৃত্তি করতে পারত। আরতি অভিনয় মন্দ করত না, বিশেষ করে

হাসির ভূমিকায়। চন্দ্রার অভিনয় ভাল হ'ত না, নাচ তার ছিল আশ্চর্য। কিন্তু এক একবার অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিল সে আচ্ছা! স্কুল-প্রতিষ্ঠার দিনের উৎসবে ছাত্রীদের খিচুড়ি খাওয়ানো নিয়ম ছিল। বিশেষ আনন্দের দিন সেটা। নূতন ছাত্রাবাস বাড়িয়ে তৈরী করা হ'ল সেবারে। গৃহ-প্রবেশের দিন কি হই-চই! বিরাট ভোজ, নাচ-গান। অনেক দিন আগে থেকে জল্পনা-কল্পনা চলেছিল, ওই স্মরণীয় দিনে কি খাওয়া হয়ে, কি অভিনয় হবে, কে কি ভার পাবে। কাজের ভার ভাগ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা অভিনয়ের ভার পেয়েছিল। 'নূরজাহান' বইটা তারা অভিনয় করেছিল। চন্দ্রাকে একটা বিশেষ ভূমিকায় নিয়েছিল। চন্দ্রা হাঁটু গেড়ে, হাত নেড়ে কাঁদ-কাঁদ সুরে পার্ট বলেছিল: "আর নারী কেবল ভালবাসতেই জানে!" তাই নিয়ে বন্ধুদের কি ক্ষ্যাপানো ওকে! এমন পার্টে আর নাবেনি ও।

প্রাক্তন ছাত্রী-সম্মেলনে পুরনো ছাত্রীদের জমা হওয়ার উৎসব হ'ত প্রতি বছর। প্রবেশিকা পরিক্ষার্থী ছাত্রীদের পুরনো স্কুল থেকে বিদায় দেওয়া হ'ত ফেয়ারওয়েল পার্টিতে—নাচ-গান অভিনয় দেখিয়ে-শুনিয়ে, খাবার খাইয়ে, কবিতা লিখে। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে কেউ বিদায় নিতে গেলেও তাই। মুখের হাসিতে চোখের জল মিশত। এ-সব কবিতা লেখার ভার বেশীর ভাগ মঞ্জুর ওপর পড়ত। স্কুলে তখন আরও দু'টি নাম করা কবি ছিলেন, হিরণ্ময়ী সেন, বিজয়া সেন। তবু মঞ্জুর ডাক পড়ত আগে।

গান দিয়ে স্কুল বসত। প্রার্থনা বা প্রেয়ার করে তবে দিনের কাজ আরম্ভ! সার বেঁধে ছাত্রীরা প্রকাণ্ড হলটাতে যেত। সমবেত কণ্ঠে একটি সংস্কৃত বৈদিক মন্ত্র বলার পরে একটা ব্রাহ্মসঙ্গীত গাওয়া হ'ত। আবার একটি মন্ত্র বলে প্রণাম। কেউ প্রার্থনায় যোগ না দিলে চলত না।

পুরস্কার-বিতরণ হ'ত জাঁকজমকে। গোটা স্কুল—বোর্ডিং-বাড়ী—মালা, নিশান, ফুল, পাতায় সাজত। মাঠে পড়ত প্যাণ্ডাল। মঞ্চ বেঁধে অভিনয় ইত্যাদির আয়োজন করা হ'ত, কত লোক আসতেন! স্কুল-জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন সেটি। যারা পুরস্কার পেত কি আনন্দ তাদের! জরির-ফিতে বাঁধা বই, খেলনাপত্র, গানের মেডেল! মঞ্জু নিচু ক্লাস থেকে পুরো নয়টি বছর পড়ে প্রবেশিকা দিয়েছে। একবার ডাব্‌ল প্রমোশন পায় ও। ন'বছরের এক বছরেও পরীক্ষাতে কখন দ্বিতীয় হয়নি মঞ্জু। আগাগোড়া প্রথম প্রাইজ পেত। আরতি, রেণুকা, মিনতি ও অন্যান্যরা ভাগ্যমত দ্বিতীয়, তৃতীয় হ'ত। গৌরী সেলাই, চিত্রাঙ্কনে পুরস্কার পেত। ছবি-আঁকা, সেলাই-এর পুরস্কার একজনের ভাগ্যে নির্দিষ্ট থাকত না।

কিছুদিন ধরে প্রতি শুক্রবার লেখাপড়া সম্পর্কে মিটিং বসত। ম্যাগাজিন-কমিটি একটা ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েরা কবিতা আলোচনার একটা ক্লাস বসাত। গার্লস্ গাইড, লণ্ঠন-লেক্‌চার ইত্যাদি তো ছিলই। ছাত্রীদের স্কুল থেকে এখানে-ওখানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। এক

আধবার দূরদেশেও যায় তারা—যেমন রাজগীর, দার্জিলিং। রাজগীরে দেদার মজা হয়েছিল। কিন্তু সে অভিযানের গল্প তুললে নিছক একটা স্কুলের গল্প তোমরা শুনতে চাইবে না, নীরস লাগবে।

থেকে থেকে নাজেহাল করে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা চলত। ইন্স্পেক্ট্রেস্ আসার দিনের কালোছায়া ছিল। বকুনী, পড়া, পরীক্ষায় ভয়। তবু আনন্দের ভাগ বেশী। স্কুল প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিনে তাঁর লেখা কবিতার আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, নূতন হষ্টেলের জন্য টাকা তুলতে চ্যারিটি অভিনয়, স্কুলের মাঠে এগজিবিশন—নানা উত্তেজনায় মেয়েরা লেখাপড়ার সঙ্গে ব্যস্ত থাকত।

স্কুলের মাঠে এগজিবিশনের নানা ষ্টল্ বসত। জামা-কাপড়, চুড়ি-মালা, সাবান-গন্ধ, খেলনা, বই-এর সারি সারি দোকান। বিস্তর লোকের যাতায়াতে প্রদর্শনীর তিনটি দিনে হাসিখুশীর সুর লাগত। খাবার ও চায়ের দোকান বসত, আসত নাগর-দোলা। মিস্ বাসু একটা লুচি-মাংসের দোকান দিতেন। মিস্ সেন ভাগ্য-গণনার তাঁবু খুলে বর্মী মেয়ের পোষাকে বসতেন। টিকেট বিক্রী করে মেয়েদের অভিনয় করানো হ'ত। একবার হয়েছিল 'ডাকঘর'। বড় মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়ে মঞ্জু প্রহরী, চন্দ্রা সুধা, মিনতি দইওয়ালা সেজেছিল। তাদের শিক্ষয়িত্রী ডলিদি ঠাকুর্দা সেজেছিলেন, একটি বাইরের মেয়ে সেজেছিলেন অমল, নাম বুলবুল দি'।

উৎসবের দিনেও মেয়েরা সাধারণতঃ স্কুলের ইউনিফর্ম,

লালপাড় সাদা শাড়ী, জামা, চুলে লাল ফিতে, এই সাজে যোগ দিত। কাঁধে পিন্ এঁটে মিস্ বাসু কাপড় ধরে রাখতে বলেছিলেন। সুতরাং পিন্-আঁটা চল ছিল। চটি-পায়ে চটাস্ চটাস্ করে ঘোরা তিনি পছন্দ করতেন না, তাই শু জুতো পরতো সবাই। চুল এলিয়ে আসা চলত না, বেণী বাঁধতে হ'ত। স্কুলের দিনে বই, খাতা, পেন্সিল সমস্ত গুছিয়ে হাতব্যাগে আনার নিয়ম ছিল। মাঝে মাঝে মিস্ বাসু তদন্তে এসে সকলের হাতের নখে, চুলে জামা কাপড়ে ময়লা আছে কিনা দেখে যেতেন। আঁট সাঁট পরিষ্কার সাদাসিধে সপ্রতিভ সাজ ভালবাসতেন মিস বাসু। একটু এধার-ওধার হ'লে বক্‌বক্ করতেন, সকলের সামনে দোষ ধরিয়ে লজ্জা দিতেন। কিন্তু, ফলে ওই স্কুলের মেয়েদের মত ঝকঝকে মেয়ে অন্য কোন স্কুলে সে যুগে ছিল না। পড়া-শোনাতেও ফল তারা সব থেকে ভাল করত। স্কুলটাকে 'Eton of Calcutta' বলা হ'ত। ও স্কুলে জায়গা পাওয়া একটা কাম্য বস্তু ছিল।

পড়ার সঙ্গে খেলাধূলোর কৃতিত্বও দেখিয়েছিল ছাত্রীরা। উৎসব-আনন্দও জীবনে তাদের বহু ছিল। লেখাপড়ার সঙ্গে আবার নিত্য নূতন উৎসাহ-আনন্দে স্রোতের জলের মত তরতর করে হাসিকান্নার দিনগুলি বয়ে চলত।

মঞ্জু রাস্তার ওপরে বাড়ীর ছাদে বেড়াচ্ছে আর নিজের মনে হাসছে। আজ কালকার দ্বিতীয় শ্রেণীর আধুনিক ছাত্রীরা আমাদের মঞ্জুর ধরণ-ধারণ দেখলে অবাক হয়ে যেত নিশ্চয়। ক্লাশের বন্ধুরা ওর আহ্লাদে-পণা দেখে আদর করে ওকে ক্ষ্যাপাবার উদ্দেশে নানা নাম দিয়েছিল, যথা Spoilt Child, Mother's Darling, আহ্লাদী ইত্যাদি। লাইব্রেরীতে অফ্ পিরিয়ডে সকলে মন দিয়ে বইখাতা ছড়িয়ে বসে পড়া-শোনা করছে, হঠাৎ মঞ্জু ঝড়ের মত ঘরে এসে লম্বা টেবিলটার খাতা বই এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বলল, "আমি এখন এখানে শোব। ঘুম পাচ্ছে।"

সিনেমায় মেয়েদের স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাশে-বসা জ্যোৎস্না মৈত্রকে মঞ্জু পীড়াপীড়ি করতে লাগল জল চেয়ে চেয়ে। সেও তো ছোট। তবু বাধ্য হয়ে জ্যোৎস্না উঠে বারান্দায় গেল জলের খোঁজে। কোথা থেকে জল এনে খাওয়ায়, তবে মঞ্জু শান্ত হয়। রান্নার দিনে কইমাছের পাতুরী হয়েছে। মঞ্জু পারে না কাঁটা বেছে খেতে। বীণাগুহ বেছে দিল। রাজগীর যাবার পথে ট্রেনে মঞ্জু হঠাৎ ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে, 'মা, মা' বলে ডেকে উঠল। আরতি 'ভয় নেই, ভয় নেই' বলে চাপড়ে তাকে ঘুম পাড়াল, যেন ছোট শিশু। মায়ের মত মমতা-মাখা আরতির সেইমুখ মঞ্জুর চিরদিন মনে আঁকা ছিল। মজা করেও মঞ্জু প্রায় আহ্লাদ-ন্যাকামী করত। তার চরিত্রে এ-ও এক দিক।

অন্য দিকটা আবার অতিগম্ভীর বিদ্যাবতী, যে ভাল লিখতে পারে, যার কল্পনা আছে। মোটের ওপর মঞ্জু, জগা-খিচুড়ি।

এই গল্পে মঞ্জুর কথা একটু বেশী বলা হচ্ছে বুঝছি। কিন্তু, তাই বলে তোমরা ভেবে নিওনা যে মঞ্জুই এ গল্পের নায়িকা। সব কয়টি লোক সমান ভাবে দরকারী। কেউ বেশী, কেউ কম নয়। তবে পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারদিকে ফেরে, যেমন করে মঞ্জুরা দেখিয়েছিল, তেমনি করে একজনের চারপাশে গল্প গাঁথতে হয়। সে মালাগাঁথার সূতো মঞ্জু— আর কিছু নয়।

মঞ্জু ছাদে বেড়াচ্ছে আর আরতির লেখা কবিতাটা মনে করে হাসছে। আরতি ভাল লেখে, ছন্দের হাত সুন্দর। সে একটা মজার কবিতা লিখেছে ন্যাড়া লোকের বিষয়ে। সেইটা মঞ্জু বলছে :—

"একে ন্যাড়া মাথা তায় নাই ছাতা
রোদে, জলে, মেঘে ঝড়ে ;
বেলতলা দিয়ে যেতে যেতে হায়,
বেল খসে' খসে' পড়ে।"...

আজ স্কুলে কবিতাটা শুনে সবাই হেসে খুন। এক এক জন এক রকম করে আবৃত্তি করতে লাগল নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। মিনতি বীররস দিয়ে বলল। নীলিমা সবে জাহাজ

থেকে নামা সাহেবা খ্যাঁষা বাঙ্গালার মত চিবিয়ে চিবিয়ে জড়ান উচ্চারণে বলতে লাগল :—

"একে নেড়া মাঠা টায় নাই চাটা,
রোত্তে, জলে, মেগে, জরে ;
বেলটলা ডিয়ে যেটে যেটে আয়,
বেল কসে কসে পড়ে।"—

কবিতাটা, নীলিমার উচ্চারণ মনে পড়ে মঞ্জু হাসছে। মধ্যে মধ্যে আলসের ওপর উঁকি দিয়ে দেখছে ওর খেলুড়ী বন্ধুরা আসছে কি না। রোজ বিকেলে বাড়ীর ছাদে বাড়ীর বন্ধুদের এক খেলার আড্ডা জমে। মঞ্জুর প্রাণের বন্ধু দুই ছেলে আসে রোজ—সম্পর্কে কাকা বুদ্ধ, মামা বিমল। কিছুদিন আগে নিয়মিত আসত পাড়ার মনোহারী দোকানের বর্দ্ধিষ্ণু মালিক শরৎবাবুর নাত্নী বেলা। সামনের ব্রাহ্ম আচার্য্য সতীশবাবুর বাড়ীর ছোট মেয়েদের কেউ কেউ ভাসা ভাসা ভাবে আসত, যেমন বুলু। বেলা গান গাইত মিষ্টি গলায়। মঞ্জুর গলা ছিল দলের মধ্যে সবচেয়ে চড়া, সতেজ। কিন্তু, পাপিয়া বাসা বেঁধেছিল টুনুর গলায়। ক্রমে ভাল গান শিখছিল টুনু। সুরেনবাবু বাড়ীতে শেখাতেন টুনুকে।

আজকাল বেলা আসে না নানা কারণে। সেতো স্কুলে-টুলে পড়ে না, বয়সেও এদের চেয়ে বড়। গোঁড়া বাড়ীর মেয়ে, ঠাকুমা লাফালাফি পছন্দ করেন না। বুলু অন্যত্র গেছে। তাতে খেলার ক্ষতি নেই। লোকের অভাব হয় না।

বুব্ধুর বোনেরা, আন্না, দুর্গা, গৌরী আসে কখনও। মঞ্জুর মাসতুতো ভাই বীরবল টুনটুনেরা আসে। দেশ থেকে বাড়ীতে অনেক আত্মীয়-স্বজন এসে এসে দীর্ঘকাল থেকে যেতেন। তাঁদের দলের ছেলেমেয়েরা খেলায় যোগ দিত। পিসতুতো বোন রেণু, বকুল, কলু, কুন্তলাদি, ভাই অজিত, অতুলদা, শিবুদা খেলাধূলায় উৎসাহ দিত।

যেদিন বেশী খেলুড়ী জোটে সেদিন দারুণ খেলা হয়। পুরণো ছাদে এত লাফালাফি দেখে পুরণো চাকর নবকাকা ভয় পায়, হুঁকো হাতে চীৎকার করে ওঠে, "নাফিওনা বলছি। নেমে এসো। ছাদ ভ্যাঙ্গা পড়বে।" তার কথা কে শোনে? ওদের লাফালাফি বন্ধ হ'ত না, নবকাকারও ছাদ ভেঙ্গে পড়বার ভয় ঘুচত না। কোন কোন দিন চাঁদ ওঠার পরেও চাঁদের আলোতে খেলা চলত। ভারী চমৎকার লাগত। ফুলঝুরির মত সাদা আলো ঝরছে নীল আকাশ থেকে। বুব্ধু-বিমল একটু দূরে থাকলেও অসুবিধা হ'ত না। বেপরোয়া ছেলে ওরা।

ছাদে বেড়াতে বেড়াতে টুনুর বাড়ীর দিকে চেয়ে মঞ্জু ভাবছে, আজ হয়তো টুনু আসবে না। ক্রমেই আসা কমে যাচ্ছে ওর। জীবনে টুনুর নূতন সুর লাগছে, সে সুর মঞ্জু ধরতে পারছে না। ছেলেখেলায় আর টুনুর রুচি নেই। বড়দের মত লুটিয়ে শাড়ী পরে ও ভিজে চুল ছোট ছোট বিনুণীতে গেঁথে সামনের সোজা চুলকে কুঁকড়ে ফেলেছে ও।

কখন মায়েদের মত পায়ে আলতা পরে; বড়দের পেছনে পেছনে ঘোরে, কথার মধ্যে বসে কথা গেলে! ওদের বাড়ীর একটা আবহাওয়া আছে—হৈ-হুল্লোর আর সস্তা আড্ডার। ছোটদের পক্ষে উপযোগী নয়। সেখানে কত কি বাজে আলোচনা হয়! জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে কত মিথ্যা ধারণা গজিয়ে ওঠে ছোট মনে। টুনু ভাবতে শেখে, জীবনে সস্তা আনন্দ শেষ কথা। এটা যে লেখাপড়ার সময়, এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করে নিলে লম্বা জীবন ভোর ফুর্ত্তি করা যাবে·একথা টুনুকে সেদিন কেউ বুঝিয়ে দেয়নি। গৃহশিক্ষক ছিল তার, বড়লোকের মেয়েদের যেমন নীচু ক্লাশ থেকে থাকে। কিন্তু যেদিন কোন হুজুগ থাকত, যেমন বেড়াতে যাওয়া বা বাড়ীর কোন উৎসব, নির্ব্বিবাদে টুনু না পড়ে মাষ্টার-মশায়কে ফেরৎ দিত। তাঁর দেওয়া কাজ ও নিয়মিত করে রাখত না। মাথা ছিল। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে প্রাণপণে পড়ে নিত। পাশ করে যেত, কখন 'পঞ্চম' পর্য্যন্ত হয়েছে পরীক্ষাতে। টুনুর বাড়ীর লোকেরা বিদ্বান, কিন্তু ছোট ও বড়র যে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ আছে, এ কথা মনে রাখেন নি। তা ছাড়া বাইরের জিনিষ অর্থাৎ টাকাকড়ি, সাজপোষাক, বাড়ীঘর এসবে জোর দিতেন। অর্থের অহঙ্কার ছিল।

ফলে টুনু অন্যপথে চলল। অল্প বয়সে সে ভুল বুঝে নিল যে টাকাই জীবনের একমাত্র সত্য—সেই টাকা তাদের আছে।

তারা সাধারণের ওপরে। মেয়েদের জীবন? কেন, বেশ চমৎকার একটি বিয়ে! বড় মানুষের বউ হওয়াই মেয়ে-জন্মের সার্থকতা। যে পুরুষ দেখতে ভাল সে-ই আদর্শ ব্যক্তি। বিয়ে-বিয়ে কেমন একটা ভাব এসে গেল টুনুর। ছেলে খেলা ভাল লাগবে কি করে?

কি ভুল! অল্প বয়সে বড়দের সঙ্গে মেশা, গল্প, তাঁদের আদর্শে বুড়োটে ভাবে চলা, কি ভুল! একদিন ত বড় হ'বই; তখন ত জীবনের এই দিক পাবই। আগে থেকে কেন বুড়ো সাজি? এই যে দিনগুলো আমার—ঢেউএর মত বয়ে যাচ্ছে,— ভাবনা নেই, কষ্ট নেই,—এসব দিন ত ফিরে আসবে না। তাই আনন্দ করে নেই যত পারি; এদের ভোগ করে নেই।

সেদিন এত কথা মঞ্জুর মনে হয়নি, কিন্তু অাবছাভাবে সে বুঝেছিল টুনুর জগৎ মঞ্জুর জগৎ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আর টুনুকে ফেরান যাবে না। 'দেখি তবু একবার ডেকে'— রাস্তার পার থেকে মঞ্জু চীৎকার করতে লাগল, "টুনু, টুনু!"

ছোকরা চাকর দেখে গেল কে ডাকছে, টুনু এল না। মঞ্জু উঁকি দিয়ে দেখতে পেল ঘরের মস্ত আয়নার সামনে থেকে টুনু সরে যাচ্ছে। ওখানে দাঁড়িয়ে টুনু পোষাক পরছিল। সেই টুনু! ক'দিন আগেও মোজা পরে জুতো পরতে ভুলে যেত। ধমক দিয়ে বাড়ীতে ফেরৎ পাঠাতে হ'ত জুতো পরে আসবার জন্য। খালি পায়ে ঢ্যাং-ঢ্যাং করে টুনু

রাস্তা পার হ'ত মোজা নোংরা করে। এত ছেলেমানুষ ছিল টুনু।

মঞ্জুর সঙ্গে মেলামেশায় নূতনত্ব নেই টুনুর কাছে—মঞ্জু সে এখন ছোট হয়ে আছে। মঞ্জুর গলা ফাটা ডাক তাই টুনু শুনেও শুনল না। সেই টুনু! ক'দিন আগেও চঞ্চল মঞ্জুর হাতে বাড়ীর কোন জিনিষপত্র ভেঙে গেলে সে টুনু মা-বাবাকে 'আমি ভেঙেছি' ব'লে দোষটা নিজের ঘাড়ে নিত! এত ভালবাসত টুনু মঞ্জুকে।

সকলের আগে এল বুদ্ধু। 'বুদ্ধু-ভূতুম' বলে মঞ্জুর বড়দা ক্ষ্যাপাত। পাতলা ছেলেটি, ফর্শার দিকে গায়ের রং। বড় চোখ। মা-বাবার এক ছেলে। তাই গোলগাল খোকাপুতুলের মত মুখখানাতে আহ্লাদে ভাব ছিল তখন। সরু ডুরিটানা মিহি কাপড়ের পুরোহাতা শার্ট পরত, পায়ে ফিতেবাঁধা চকচকে জুতো। সার্টের কলারে ইস্ত্রি থাকত কড়া, আস্তিনে সোনার বোতাম। বেশ ছিম্‌ছাম্ ছিল বুদ্ধু, ভদ্রগোছের। হুড়োহুড়ি অবশ্য সে অসম্ভব করত, কিন্তু নোংরা হত না বেশী কখন। খারাপ কথা বলতে কেউ তাকে শোনে নি। হেয়ার স্কুলে পড়ত ও। লেখাপড়াতে মন ছিল। মঞ্জুর অন্তরঙ্গ বন্ধু, লেখার চেষ্টাও করত মঞ্জুর মত। বাদুড়বাগানে থাকত বুদ্ধু, পাশে লাগাও খাবারের দোকান। সে দোকানে সুস্বাদু বরফি সন্দেশ বানাত। মঞ্জুরা বেড়াতে গেলে বুদ্ধুর মা কিনে খাওয়াতেন। আচার, জেলি এসব জিনিষ তৈরি করাতে বুদ্ধুর

মায়ের নাম ডাক ছিল। অনেক প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিতেন, মেডেল পেয়েছিলেন। শিশি-বোয়ম ভর্ত্তি করে করে নানা ধরণের আচার উঁচু তাকে তুলে রাখতেন। সে সবে, বিশেষ করে ছড়-তেঁতুলের মিষ্টি আচারে মঞ্জুর লোভ ছিল প্রচুর। বেড়াতে গেলেই বুব্ধুর মা নাস্তা মঞ্জুকে ভরপেট আচার খাওয়াতেন।

বুব্ধু এল। আলসের গায়ে উঁচু শানের ওপর বসে কি গল্প। বুব্ধুর স্কুলের গল্প, মঞ্জুর স্কুলের গল্প। তখন স্কুল ছিল ওদের প্রাণ।

মঞ্জুর মামা বিমল এবার লাফাতে লাফাতে ছাদে উঠে আসল। হ্যারিসন রোডে থাকে, সংস্কৃত স্কুলে পড়ে। দাদা-মহাশয় সংস্কৃতে পণ্ডিত, উপাধি শাস্ত্রী। বিমল দুর্দান্ত ডানপিটে ছেলে। মাথায় উস্কো-খুস্কো একমাথা কুচকুচে কাল চুল, সাজ আলুথালু। ওস্তাদ মারামারিতে। সবাইকে মারধোর করত, কিন্তু মঞ্জুকে কখন মারেনি ও। বুব্ধুর যেমন ঝোঁক ছিল পড়াশোনায়, বিমলের ছিল বিপরীত দিকে ঝোঁক। চঞ্চল হাত দুটো। কত কাজই ওই হাত দিয়ে করতে পারত! কার্ডবোর্ড, কাঠের টুকরো দিয়ে একপ্রস্থ পুতুলের আসবাবপত্র বানিয়ে দিয়েছিল মঞ্জুকে। কালিপুজোর সময়ে ওর তৈরি বাজির মত বাজি কেউ তৈরি করতে পারত না। এবারেও ত একটা চুপড়িতে অনেক তুবড়ি পাঠিয়েছিল মঞ্জুকে—নিজের তৈরি। ইলেক্ট্রিক, সাদা দু'রকমের ছিল। চমৎকার

জ্বলেছিল। কিন্তু, সেই ছেলে জীবনে কাজ বেছে নিতে ভুল করল। নিজের, অভিবাবকের দোষে। পড়ায় যা'র মন নেই, সে গেল সাধারণ ছেলের মত পড়তে—শিল্প লাইনে গেল না। স্বাধীন ভারতবর্ষে যারা শিল্পসম্ভার দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলবে, তাদের শেষ হচ্ছে এইভাবে সরকারী গোলামখানায়!

শীতের দিন। মঞ্জুর গায়ে যে র‍্যাপার, তারই যোড়া বিমলের গায়ে। মঞ্জুর বাবা কাশ্মীর থেকে এনে দিয়েছেন। তখন মামাবাড়ীর সঙ্গে যথেষ্ট যাতায়াত ছিল মঞ্জুদের। এত যোগাযোগ ছিল যে বাড়ীতে কিছু জিনিষ এলে অর্দ্ধেকটা যেত মামার বাড়ী উপহার। মঞ্জুদের বাড়ীতে লোক বেশী ছিল না। কিন্তু, মামার বাড়া একটি বিরাট ব্যাপার। একান্নবর্ত্তী পরিবারে খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই একত্রে বাসা বেঁধেছে। অনেক লোক, অনেক গোলমাল। আবহাওয়া যে সব সময়ে ভাল তা নয়। তবু হট্টগোলের একটা সুর ছিল, যা নিজের বাড়ীর ভদ্রতা মেশানো ঠাণ্ডা বাতাসে মঞ্জু খুঁজে পেত না। যখন মন হ'ত নিঃসঙ্গ তখন সে গোলমালের হাটে নিজেকে মিশিয়ে দিলে ভালই লাগত। যতদিন দিদিমা বেঁচে ছিলেন, সর্ব্বদা টানতেন তিনি নাতিকে নিজের কাছে। একদিন দেখা না হ'লে ব্যস্ত হ'তেন। এটা-ওটা খাওয়াতেন, এটা-ওটা দিতেন। মঞ্জুর মনে হ'ত দিদিমার জীবনের চরম সুখ বোধ হয় লোককে খাইয়ে। যে কোন লোকই হোক, নিস্তার ছিল না। ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করে চাট্টি বেশী তিনি খাওয়াবেনই।

ছেলেবেলায় জীবনে অনেক লোক আসে, বড় বয়সে যারা দূরে চলে যায়। মৃত্যু ও বিচ্ছেদের মধ্যে তাদের হারিয়ে ফেলি আমরা। কিন্তু ছেলেবেলার দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাই তারা গাঁথা রয়েছে স্মৃতির আলোছায়া বুননীর ফাঁকে ফাঁকে। মঞ্জুর জীবনে মামাবাড়ীর অসংখ্য লোক কত কাছে এসেছিল। তাদের কথা একটু না বল্লে মঞ্জুর জীবনের কথা ঠিক বলা হয় না।

মামার বাড়ীতেও দারুণ খেলা হ'ত দু'দলে। মঞ্জু কখনও মামা বিমল ও তার বন্ধুদের সঙ্গে ছুটোপাটী খেলা খেলত, কখনও মেয়েদের সঙ্গে মিশে পুতুল খেলত। মামার বাড়ীতে ও পাড়ায় তখন বহু মেয়ের সমাবেশ হয়েছিল। বড় বড় পুতুলের বাক্স সকলের থাকত। আচ্ছা খেলা হ'ত। মঞ্জুর নিজের মাসী লীলা, খুড়তুতো মাসী চিনু-খটু এরা ছিল। মায়ের খুড়োর নাত্নী দিলু ছিল। পাশের লাগাও বাড়ীর মেয়ে ছিল আব্লি। ভারী মিষ্টি মেয়ে। বয়সে বড় মেয়েরা, লীলা মাসীমার বন্ধু দিদিস্থানীয়া পাড়ার বিজুদি, রেণুদি পুতুল খেলায় যোগ দিতেন। অন্য ধরণের মেয়েলী খেলাও হ'ত মাঝে মাঝে। মঞ্জুর বড় মাসীমা শৈল, দিলুর মা, রেণুদির দিদি প্রতিমা—বড়রা পর্য্যন্ত পুতুলের বিয়ে খেলাতে যোগ দিতেন। পুতুলখেলার গল্প শুনে পুতুল-খেলুড়ীরা খুসী হচ্ছ, বুঝেছি। মঞ্জু কিন্তু তোমাদের মত অল্প বয়সে খেলা শেখেনি। তখন ও ছেলে-ছেলে ছিল। বলতে গেলে, বুড়ো বয়সে মঞ্জু

মামাবাড়ী থেকে পুতুল খেলা শেখে। কিছুদিন ধরে পুতুল-খেলা সে-ও খেলেছিল। পুতুলের বাক্স রেখেছিল, রাজ্যের কাপড়ের টুকরো. পুঁতির গহনা সাজিয়ে। দু'একবার পুতুলের বিয়েও দিয়েছিল। লীলামাসীর কাছ থেকে মঞ্জু পুতুলখেলা শেখে, বিস্তর পুতুল উপহার পায়। মাসার ছিল কড়ির পুতুলের সংসার। রেণুদিরা সৌখিন সম্প্রদায়ের লোক, তাঁরা গাটাপার্চ্চার ডল চল করেছিলেন। মঞ্জু পুতুলের বিয়ে দেওয়া পছন্দ করত না, তবে দলে ভিড়ে দিতে হ'ত। খেলাতে উৎসাহ কম ছিল না তো। এ সব বিয়েতে ভোজও হ'ত। 'দানাদার' মিষ্টির আদর ছিল. পয়সাতে একটা। রসমুণ্ডিও আনা হত একপয়সায় চারটে। যুদ্ধের আগের যুগের কথা শুনে তোমাদের নিশ্চয় হিংসে হচ্ছে, না? কত সস্তায় আমরা মিষ্টি খেয়েছি জানো? দু' আনার রাজভোগ ছিল চার আনার রসগোল্লার চারটের থেকেও বড়। মামাবাড়ীর পথে সীতারাম ষ্ট্রীটের এক দোকানে প্রকাণ্ড হাঁড়ির রসে বিরাট মূর্ত্তি নিয়ে ভাসত লালচে রংয়ের রাজভোগ। বাবা বাড়ী ফিরবার সময়ে কিনে কিনে আনতেন। মঞ্জু গোটা মিষ্টিটা অনেক বয়স পর্য্যন্ত আস্ত খেয়ে উঠতে পারেনি। ছুরি দিয়ে অর্দ্ধেক করে তাকে কেটে দিতে হ'ত।

কাজেই বোঝ মিষ্টান্নের বাজারটা। পুতুল বিয়েতে সামান্য পয়সা খরচ করলেই মিষ্টির অভাব বোঝা যেত না। টুনুর পুতুলের সঙ্গে একবার মঞ্জুর পুতুলের বিয়ে হয়েছিল।

বড়দেরকে পর্য্যন্ত নেমতন্ন করা হয়েছিল, তাঁরা মজাতে যোগ দিয়েছিলেন। ভোজ হয়েছিল। টুনুর নেমন্তন্নে সে কচুরী-সিঙ্গারা-সন্দেশ ইত্যাদি বাজারের খাবার করেছিল। মঞ্জুর নেমন্তন্নে মঞ্জু ওসব তো করেছিলই, তা ছাড়া মাকে দিয়ে লুচি-তরকারী বানিয়ে আচার দিয়ে আলাদা রেকাবে পরিবেশন করেছিল। সেদিন টুনুকে হার মানতে হয়। সরস্বতী পূজোর সময়ে কিন্তু টুনুর বাড়ীতে ধুম-ধাম হোত বেশী বড়লোকী চালে। মঞ্জুর বাড়ীতে আনন্দ থাকলেও আড়ম্বর কম। ভোগ ছিল বাঁধা, খিচুড়ি, বেগুণভাজা, বাঁধাকপির ঘণ্ট ফুলকপির ডালনা, রাঙ্গাআলুর চাটনি, পায়েস, লুচি, দই, মিষ্টি, কাটা ফলমূল। ধামা ধামা কড়াইসুঁটা ছাড়ানো হ'ত খিচুড়িতে দেবার উদ্দেশে। মঞ্জুর ছোটকাকা খাগের কলম সরু করে কাটতেন, লাল-নীল কাগজ কেটে শিকল বানিয়ে দিতেন। একটু সৌখিন পছন্দ ছিল ছোটকাকার। জামা-কাপড় পরিষ্কার, জুতোর চামড়ায় মুখ দেখা যায়। তাঁর স্বভাবের বিশেষত্ব ছিল ধার আর প্যালিশ। মঞ্জু ছিল ছোটকাকার একনিষ্ঠ ভক্ত। নিজের দুই দাদার সঙ্গে চুলোচুলি লেগে থাকত। কাকাকে কি ভালই বাসত মঞ্জু! তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ওর আদর্শ ছিলেন—দূরে যেয়েও।

মামাবাড়ীর পুতুলখেলার মরশুমে পড়লেও মঞ্জু অন্য মেয়েদের মত ওতে ডুবে থাকতে পারত না। বিমলের অসংখ্য বন্ধু ছিল পাড়াতে—মদন, সুবল, ফণী, সুধীর।

মামাবাড়ীর লাগাও খানিকটা খোলা জমি ছিল। সেখানে ছেলেদের দলে লাফ-ঝাঁপ, দৌড়াদৌড়ি চলতো মঞ্জুর। ওর সঙ্গে ছেলেরা দৌড় লাফে আঁটতে পারতো না। 'রবিনহুডের' দল খুলে ছিল মঞ্জু। স্বাধিকারে মঞ্জুই ছিল দলপতি-রবিনহুড। অবশ্য এ আগের কথা।

পাঁচমেশালী মামার বাড়ীতে নানারকম লোক আসত-যেত। বয়স্কলোকেরা মঞ্জুকে স্নেহ করতেন। বড়মামা অমূল্যের বন্ধু, নীতিশমামা, রামকৃষ্ণমামা, চিনু-ঘটুর দাদা ভবেশ, মায়ের খুড়তুতো ভাই ক্ষিতীশ-বাঁটুল, এক বাড়ীতে সবাই থাকতেন। বাইরের দূরসম্পর্কীয়রা আবার খেয়েদেয়ে ওখানে আশ্রয় পেতেন। তাদের মধ্যে নরেনদা, নৃপেনমামা ছিলেন। দাদামহাশয়ের ডুঁদে ছাত্রেরা কেউ কেউ গুরুগৃহে থাকতেন, যথা, কানাই-বলাই। সকলে মঞ্জুকে আদর যত্ন করতেন। ছোটমামা বিমলের দিকে চেয়ে সেদিন মঞ্জুর মনে মামাবাড়ীর প্রকাণ্ড পটভূমি জেগে উঠল। সকলের ওপরে মনে ভেসে এল সৌম্যমূর্ত্তি দাদামহাশয়। দাড়িগোঁফে ঠিক রবিঠাকুরের ছবির মত দেখতে তিনি।

বিমল লাফিয়ে উঠে আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করল, "এইযে, হাঃ হাঃ! কিরে বুদ্ধু, আগেই এসেছিস?"

ছাদের জায়গা ছোট, থাম দিয়ে, আলসা বেঁধে ঘেরা। ফুলের টবে, গাছে পা ফেলা দায়। মায়ের সখ টুনুদের প্রকাণ্ড ছাদ। মঞ্জু অবাক হয়ে ভাবত, অত বড় ছাদে কেউ একবার

ওঠেনা পর্য্যন্ত। তবু মঞ্জুদের ছোট ছাদে জমাট খেলা হ'ত। কুমীর-কুমীর, কানামাছি, রাক্ষসের বাড়ী, কাঁকড়া। শেষের দু'টি খেলা মঞ্জুদের নিজস্ব তৈরি। বলে দিচ্ছি, তোমরা খেল।

'সন্দেশ' পত্রিকায় তারা 'টাইটানিক' জাহাজডুবির গল্প পড়েছে, ভাল লেগেছে। মঞ্জুদের ছাদে যে ঘোলাজলের ট্যাঙ্ক, সেটা জাহাজ, ডুবে যাচ্ছে। মঞ্জুরা বেয়ে উঠে বসেছে ট্যাঙ্কের ওপর। নলটা ঘটাং ঘটাং করে বিমল চালাচ্ছে জাহাজ, আর বলছে, "আর রক্ষে হ'ল না। ক্যাপ্টেন, কি করব ?"

ক্যাপ্টেন মঞ্জু সাহস দেখাচ্ছে, "ভয় নেই। ভগবান আছেন।" অন্যেরা করুণস্বরে 'গেল, গেল,' 'কি হ'বে, কি হবে'; রব তুলেছে। নবকাকা একতলায় নিজের ঘর থেকে বেড়িয়ে ছাদের দিকে উঁচিয়ে একটানা চেঁচাচ্ছে, "ওই দেখ, ট্যাঙ্কোটার ডাণ্ডা ভ্যাঙা ফ্যালাল। কেউ কিছু কয়ও না। ছাদ ভ্যাঙা গেল।" ওর বাঙাল কথা শুনে সবাই আমোদ পাচ্ছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে ? তখন টাইটানিক ডুবু ডুবু। ডুবেই গেল। সকলে তড়াক করে ট্যাঙ্কের ওপর থেকে লাফিয়ে ছাদে পড়ল। কেউ শুয়ে, কেউ বসে, হাত-পা ছুঁড়ে ভান করতে লাগল সাঁতার দেবার, হাবুডুবু খাবার। কেউ বা হাঁ করে খাবি খেতে লাগল। শেষে কজন সাঁতরে উঠল রাক্ষসের বাড়ীতে। ধূলো ঝেড়ে মঞ্জুই আবার রাক্ষস সাজল, বুদ্ধু চাকর, বিমল জাহাজ-ডোবা নাবিক। রাক্ষস

সগর্জ্জনে চাকরকে, "চোখা, চোখা" বলে ডাকতে লাগল, মানুষটাকে কুটে রাঁধতে হুকুম দিল। তারপরে চল্ল লম্বা নাটক—মঞ্জুর বানানো। মানুষ কেমন করে পালাল, রাক্ষস দুঃখে বুক ফেটে মরে গেল।

কাঁকড়া খেলা মজার খেলা। একজন কাঁকড়ার মত চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে প্রথমে নীচু হয়ে বসে। সবাই সার বেঁধে টপ্‌কে যায়। কাঁকড়া আর একটু উঁচু হয়—একটু একটু করে যত পারে। শেষ পর্য্যন্ত যে টপ্‌কাতে পারে সে-ই কাঁকড়া সেজে খেলতীদের জব্দ করে। এ খেলাতে জিতত বুদ্ধু। পাতলা, ছোট মানুষ। কিন্তু মুখ চোখ বেঁকিয়ে, চার হাতপায়ে ভর দিয়ে এত উঁচু হ'তে পারত যে তাকে ডিঙোয়, কার সাধ্য?

ওসব খেলায় লোক লাগে। আজ লোক নেই। বুদ্ধু, মঞ্জু দু'জনে থাকলে শুধু গল্প করে বিকেলটা কেটে যেত। কিন্তু, শনিরূপী বিমল ছিল—ছট্‌ফট্ করতে আরম্ভ করল সে।

বুদ্ধু গল্প করছে,—"জানিস, আমাদের পাড়াতে একটা ব্যায়াম সমিতি খোলা হয়েছে। সব কসরৎ শেখানো হয়। আমি যাই ওখানে।"

"তুই আবার কি করিস ওখানে? ওসব ত বড় বড় ছেলেদের আখড়া?" মঞ্জুর প্রশ্নের জবাব দিতে বুদ্ধু খোকা-পুতুল মুখখানা গম্ভীর করে ফেলল, মুরুব্বি গদাইচালে বলল, "একজন ভদ্রলোক পায়ে করে মই ওঠান, সেই মই বেয়ে দাঁড়াই আমি।"

"তারপর ?" —মঞ্জুর চোখ ঠিকরে বেড়োয় আর কি। বিমল কিন্তু অবিশ্বাসের হাসি হাসছে।

"তারপর খেলা দেখাই। হাত-পা নাড়ি, ওঠা নামা করি টরি।"

"পড়ে যাস না ?"

"নাঃ !" জোরে জবাব এল।

মঞ্জু অবাক। বুদ্ধুকে সে যেন প্রথম দেখছে। ভালমানুষ বুদ্ধুর মধ্যে এতও ছিল, হ্যাঁ ?

ইতিমধ্যে বিমলের পকেটের চোরাই তেলে ভাজা বেগুনীর ঠোঙা তিনজনে সাবড়ে ফেলেছে। এ ধরণের বাজারে খাবার মঞ্জুর বাবা বাড়ীতে ঢুকতে দেন না। মাঝে মাঝে রস আস্বাদন করতে হলে লুকিয়ে ছাদে বসতে হয়। লঙ্কারগুঁড়ো মাখামাখি আলু-কাবলি, পেঁয়াজী আলুর চপ, ঘুগ্নীদানা এই ভাবে খাওয়া হয় এই ছাদে বসে। প্রকাশ্যে রান্নাঘর থেকে মঞ্জু পাঁপরভাজা, কাঁঠালের বিচীভাজা, সুজি-ডিম একত্রে গুলিয়ে ডিমের আমলেট, গরম গরম তৈরি করিয়ে সকলে ছাদে বসে খেত। মাঠ যেমন ছিল মঞ্জুদের স্কুলের মধ্যমণি, ছাদ তেমনি ছিল মঞ্জুর গৃহগত জীবনের মধ্যমণি। খোলামেলা ভালবাসত বেচারী। কলকাতার ছোট রাস্তার বাসা বাড়াতে প্রাণ কেঁদে উঠত—খোলা আকাশের নীচে ছাদে এসে সে প্রাণ শান্তি পেত। তাই ছাদে, খেলাধূলো, পড়া, গল্প, জলখাবার খাওয়া পর্য্যন্ত চলত। টুনু সম্প্রতি সভ্য হয়েছে, বাঁকানো চোখে মঞ্জুদের ছোটলোকী

খাওয়া দেখে। মনে মনে অবজ্ঞা করে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? টুনু কি জানে ছাদে হাতে হাতে লুকনো তেলেভাজার ঠোঙার কি লোভ? কাঁচালঙ্কার ঝালে শসার টুকরো খেয়ে নাকের জলে, চোখের জলে ছাদে লাফানোর কি মজা? খিচুড়ির জন্য কড়াইশুঁটা ছাদে বসে খুলতে কত সুখ? ঘরে দরজা জানলা বন্ধ করে গদিআঁটা চেয়ারে বসে থাকে টুনু। বর্ষার দিনে মেঘলা আকাশের নীচে আলসেতে বসে আলবার্টের Silver Pitchers; কি গরমের রোদে থামের আড়ালে বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ছাদে বসে পড়লে মন কেমন করে? টুনু কি বোঝে?

বেগুনী শেষ হওয়া মাত্র বিমল তেল-মাখা হাতখানা অনায়াসে সাটের গায়ে মুছে ফেলল। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে গায়ের আলোয়ান খুলে আলসেতে রেখে বলল, "নাঃ, বসে বসে ভাল লাগছে না। একবার ছাদে উঠি। বুদ্ধু, আয়।"

এ ছাদ দোতালার ছাদ। মঞ্জুরা খেলে রাস্তার ওপারের একতলার ছাদে। দোতলার ন্যাড়া ছাদে উঠবার সিঁড়ি নেই। অথচ উঁচুতে উঠলে তবে ঘুড়ি ওড়ানোর সুখ। মঞ্জুর দুই দাদা ঘুড়ি ওড়ানোর পাণ্ডা। দিনরাত সূতোয় মাঞ্জা; পেট-কাটা, সতরঞ্চ নানা নামের বড়-ছোট ঘুঁড়ি কেনা; লাটাই বাছা নিয়ে থাকত। তাই তারা লোহার শিক দেয়ালে পুঁতে পুঁতে দোতলার ছাদে উঠবার একটা মোটা ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

কিন্তু, কঠিন পথ। দোতলার ন্যাড়া ছাদে কাগে-বগে মুখে করে নানা জিনিষ ফেলে যেত। ছাদময় ভাঙা-চোরা খেলনা, ঝাড় লণ্ঠনের কাঁচ, কাঠের টুকরো—এসব ছিটনো থাকত। মঞ্জুর মনে হ'ত ছাদটা যেন রত্নদ্বীপ। খুঁজলে কত কি পাওয়া যায়। মঞ্জুর সখ জাগত নিজে ওঠে ছাদে, কিন্তু হয়ে ওঠেনি একবারও। দাদারা সদয় থাকলে এটা-ওটা ফেলে দিত মঞ্জুকে নীচে।

এখন বিমলের প্রস্তাবে মঞ্জু চটে গেল, "হ্যাঁ, ওখানে উঠে বুদ্ধু পড়ে মরুক, না? সবাই তোর মত গেছো নাকি?"

বুদ্ধ ইতস্ততঃ করতে লাগল। বিমল বল্ল, "যা, যাঃ! কিচ্ছু হবে না। ভা-রি এইটুকু উচু ছাদ! বুদ্ধু তো মইতে উঠে কসরৎ করে। পারবি না, বুদ্ধু?"

এর পরে বুদ্ধুর আর কি বলা সম্ভব? তখন সে জুতো খুলে বিমলের পেছনে শিক বেয়ে উঠতে স্থরু করল। মঞ্জু বাধা হয়ে চুপ করে দেখতে লাগল।

বিমল ত কাঠবেড়ালের মত তড়্‌তড়িয়ে উঠে গেল। বিপদ ঘটল বুদ্ধুর। দেখা গেল ওর 'ব্যায়াম-সমিতির' কসরৎ-শেখা বিদ্যা কাজে লাগল না। একটা শিক একটু আলগা ছিল। পা ফস্কে হাত-পা ছরকুটে বুদ্ধু পড়ল ধড়াস্ করে একতলার ছাদে। ওইভাবে চোখের সামনে বুদ্ধুকে পড়তে দেখে মঞ্জুর বুক কেঁপে উঠল। বুদ্ধ একটি শব্দও না করে চুপচাপ যেমন পড়েছিল, সেইভাবে শুয়ে রইল। ভদ্রগোছের ছেলে ও,

আগেই বলেছি। ওইটুকু বয়সেও অত ব্যথা পেয়ে চুপ করে থাকার ধৈর্য্য ওর ছিল। সেটা আশ্চর্য্য।

বিমল তাড়াতাড়ি নামতে নামতে ফ্যাক-ফ্যাকিয়ে হাসতে লাগল। বুদ্ধু জখম হয়নি দেখে মঞ্জু আশ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু, অন্যের বিপদে বিমলটার বিদঘুটে হাসি দেখে রাগে মঞ্জুর গা জ্বলে গেল। ওই ত ভুলিয়ে ভালিয়ে বুদ্ধুকে ওঠাল। দিশাহারা রাগে মঞ্জু বিমলকে বকতে সুরু করল। বিমল ক্রমাগত হাসি লুকিয়ে বুদ্ধুর কাছে এসে ওকে ওঠাবার চেষ্টা করতে লাগল।

গোলমাল শুনে মা এলেন। বুদ্ধু নিশ্চুপ। বিরক্তির রেখা কেবল থেকে থেকে ওর কপালে দেখা দিচ্ছে। যেন এ ব্যাপার সামান্য একটু অসুবিধা মাত্র—ওকে সবাই বিনা কারণে বিরক্ত করছে। বুদ্ধুর মুখে চোখে জল ছিটানো হল, বাতাস চলল, বরফ এল! নবকাকা বক্‌বক্ করতে করতে বুদ্ধুকে পাঁজাকোলে তুলে ঘরে এনে শুইয়ে দিল। মঞ্জুর মা বুদ্ধুর মাকে চিঠি পাঠালেন। বুদ্ধুর মাথা ফুলে উঠেছে, পা মচকে গেছে।

বুদ্ধুর মা ব্যস্ত হয়ে রিক্সা করে এলেন এ বাড়ী। বুদ্ধুর দশা দেখে বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "এযে কতবার হচ্ছে ওর! আর পারিনে আমি।"

"আগে আরও পড়েছে বুঝি?"—বিমল দুষ্টু হাসির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

"আর বলিস্ না তোরা। একটা আখড়ার মধ্যে ভর্তি হয়েছিল। একদিন একটা ছোট ছেলে এসে খবর দিলে, 'দেখগে, তোমাদের বুদ্ধু কেটে কুটে কি হয়েছে।' ওর বাবা তক্ষুণি ছুটে যেয়ে দেখেন যে একজনের পায়ের ওপর মইতে উঠেছিল বুদ্ধু। পড়ে একেবারে দাগড়া-দাগড়া কেটে গেছে। কতদিন চূণ-হলুদ, আইডিন দিয়ে বেঁধে শুয়ে থাকতে হ'ল। ভাল হয়ে উঠে আবার যেত। আর একদিন আবার ওমনি পড়ে গেল। তাতে ওর বাবা আখড়ায় যেয়ে বিশেষ করে নিষেধ করে দিয়েছেন ওকে নিয়ে যেন কোন কসরৎ দেখানো না হয়। আজ ত আবার এখানে পড়ল।"

বুদ্ধুর কসরৎজ্ঞানের পরিচয়ে বিমল হেসে উঠল। মা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়াতে বুদ্ধু হাঁড়িমুখে চুপ করে শুয়ে রইল।

ঘোড়ার গাড়ী ডেকে বুদ্ধুকে বাড়ী নিতে হ'ল।

একটু চলে এস। অন্য মেয়েদের দিকে দেখ। ওইদিনে ওই সময়ে বাকী তিনজন কি করছে দেখ।

নন্দিনী রাস্তার দিকের বারান্দায় পাটী পেতে বসে উলের মাফলার বুনছে, নতুন শিখেছে। খুকু পাশে বসে মন দিয়ে দেখছে। দু'জনে নানা এলোমেলো গল্প করে যাচ্ছে। হঠাৎ নন্দিনী বলে উঠল, "ছাখ খুকু ছাখ ভাই, কাণ্ডটা!"

খুকু ঝুঁকে দেখল রাস্তা দিয়ে জাঁকজমকে রিক্সা চড়ে যাচ্ছেন যিনি সেজেগুজে, তিনি আর কেউ নন তাদের ধোবানী। পরণে নন্দিনার আদরের নীলাম্বরী শাড়ীখানা। মনিবমেয়ের ভাল শাড়ীখানা পরে বেড়াতে যাবার লোভ সামলাতে পারেনি। পড়বি ত পর নন্দিনীর চোখেই। নন্দিনা সাপের মত "গজরাতে লাগল, আস্পর্দ্ধা দেখ! আমার শাড়ী পরে বাড়ীর সামনে দিয়ে চলছে। ভেবেছে রিক্সা চড়ে গেলে কেউ ওকে দেখতে পারবে না।" খুকু টিপ্পনী দিল, "বোধ হয় কুটুম-বাড়া চলেছে। তাই পয়সা খরচ করে গাড়ী চড়েছে।"

নন্দিনীর ঘেন্না বেশী আগেই বলেছি। এখন ও ধোবা-নীকে নিজের শাড়ী পরতে দেখে বলতে লাগল, "মাগো! ও শাড়া আর আমি পরতে পারব না, বাবাঃ।"

গেল ভাল শাড়ীখানা!

চন্দ্রা মায়ের কথামত গায়ের চামড়ায় গোলাপজলের সঙ্গে গ্লিসিরিন মিশিয়ে মাখছে। হাল্কা ব্যায়াম করে এসেছে ও। এখন একটু নাচ-গান অভ্যাস করবে।

হঠাৎ সোরগোল উঠল বাড়ীতে, "ধর, ধর্! পালা, পালা!" চন্দ্রা দৌড়ে নেমে এল একতালার লম্বা বারান্দায়। সেখানে গোলমালের মূল। অদ্ভুত দৃশ্য! ওদের বাড়ীর উঠনে

জলের মস্ত চৌবাচ্চায় দাদারা সখ করে একটি কুমীরের বাচ্চা পুষেছিলেন। একজন কে যেন উপহার দিয়েছিলেন। ওপারে লোহার ঢাকনা দিয়ে কুমীরের বাচ্চা ঢাকা থাকত। সবাই আদর যত্ন করে মাছ সুটী খেতে দিত। কিন্তু, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কুমীরটা ঘোর হিংস্র মানুষখেকো কুমীরের জাত। মাছখেকো নিরীহ কুমীর বলে ভুল করে তাকে পোষা হয়েছে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব টের পাওয়া যেতে লাগল। আদর করতে গেলে হাঁ করে খেতে আসে। মানুষের গন্ধ পেলে ফাঁাস্ ফ্যাস্ শব্দে গর্জ্জন করে। ভুলে ঢাকা খোলা থাকলেই লোকজনকে তাড়া দেয়। মাছখেকোর মত ঠোঁট তাঁর ছুঁচলো না হয়ে হতে লাগলো থ্যাব্‌ড়া। বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে জানা গেল সে মানুষের শত্রু, মিত্র ভাবে পোষা যাবে না। সকলের মাথায় হাত। কুমীরটার স্বভাব যত জঘন্যই হোক, সকলে ভালবাসতো ওকে। মায়ায় পড়ে রাখল বটে, কিন্তু কারুর মনে স্বস্তি রইল না। কখন কুমীর বাগে পেয়ে হাত-পাটা কেটে নেয় কে জানে? আজ চন্দ্রার দাদা বাপির ভাগ্যে ঘটেছে শ্রীমানের তাড়া।

দাদা ছুটছে, এঁকে বেঁকে কুমীরের হাত এড়াতে। সগর্জ্জনে লম্বা বারান্দায় পেছু ধাওয়া করেছে কুমীর। ঢাকনাটা কে ভুলে খুলে রেখেছিল। চৌবাচ্চার দেওয়াল বেয়ে উঠে নেমে এসেছে কুমীরটা। এখন বাচ্চা, কিন্তু দাপট কত! মস্ত হাঁ করেছে, ল্যাজ আছড়াচ্ছে রাগে অস্থির হয়ে। ছোটরা কুমীরের

ভয়ে ঘরে দোর দিচ্ছে। বড়রা ওকে রুখ্‌বার চেষ্টা করছে। অবশেষে ঝপাং করে চন্দ্রার বড় দাদা একটি জালে বাচ্চাকে আটকে ফেললেন। চিৎ হয়ে পড়ল খোকা কুমীর। জালের মধ্যে কি দাপাদাপি! শূন্যে তুলে ওকে আটকে ফেলা হল চৌবাচ্চায়।

চন্দ্রার মা দাঁড়িয়েছিলেন, একহাতে কলম, একহাতে চশমা। দরকারী চিঠিপত্র লিখতে বসেছিলেন। গোলমালে উঠে এসেছেন। চুপ করে দেখছিলেন এতক্ষণ। কুমীর আটকা পড়ায় আদেশ জারী করলেন গম্ভীর সুরে, "কালই ব্যবস্থা কোর তোমরা। ওকে বাড়ী রাখা নিরাপদ নয়। চিড়িয়াখানায় দিতে হবে।" কুমীর খোকার ভাগ্য ঠিক হয়ে গেল এক কথায়।

গল্পটা চন্দ্রা স্কুলে করেছিল। তারপরে ওর ক্লাশের মেয়েরা যখনই পশুশালায় যেত, তখনি ওরা কুমীরের পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করত কোনটা চন্দ্রার কুমীর, যদিও তাকে দু'একজন মেয়ে ছাড়া কেউ চোখেও দেখেনি।

বোনঝি ডলি মাসীর বাড়ী খেলা সেরে বাড়ী ফিরে গেল। আরতির মেজদা গেল পোষা বিড়ালের তদারকে। মা টেনে নেনে ছিকের ওপর তুলে খোঁপা বেঁধে দিয়েছেন রাত্রে শোবার। এখন পড়তে বসবার আগে আরতি ঝুঁকে পড়ে কাগজে রং দিয়ে ছবি আঁকছে।

বড় তাকে হ'তেই হবে। মনের মধ্যে কত আশা, কত না-বলা কথা গুমরে মরে! কি করে ভাষা দেব? ছবিতে রং দেবার সময়ে কথা ভুলে যায় আরতি। জগতের কোথাও সে আর তার ছবি ছাড়া কিছু আছে কি? জগতকে নূতন পথ দেখাবে তার তুলী, তার রং। হাল্কা নীল রং জলে গুলে তুলী ডুবিয়ে আরতি একমনে বসন্ত কালের আকাশ আঁকতে সুরু করল। দূর চক্রবালের নীচে লাল-রংএর পথ দিতে হ'বে। লালরংটা রংয়ের বাক্সে কম আছে। গেঁয়ো পথ, ডগ্‌ডগে লাল চাই। আশেপাশে আকাশের গায়ে পাখীর ডানার কাল ছাপ দিতে হ'বে। ছবির সামনের দিকে ফুলে-ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ার গাছ আঁকবে একটা বড় করে। স্কুলের গাছের কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো দেখে আসতে হ'বে কাল ভাল করে। না হয়, পেন্সিলে রেখাচিত্র দেখে দেখে এঁকে আনবে। তার পরে এ ছবিতে তুলে নেবে। গাছের নীচে একটি মেয়ে দেবে সে, বাসন্তী শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে কলসীতে জল নিয়ে চলেছে। মেয়েটির হাতে, গলায়, কাণে গহণাতে, কাঁখের কলসীতে গাঢ় সোনালী রং লাগবে। সোনায় সোনায় ছবি ভরে যাবে। সোনা রং-এ কি আনন্দ! সোনা রং-এর ফুল দেব গোটা কয়েক। খুব মস্ত করে ছবিটা আঁকা হচ্ছে। নীচে ক'লাইন কবিতা লিখে দেব। হাতে তুলী চলতে লাগলো আরতির মনে খেলতে লাগল কবিতার সুর।

বার

কয়েকটি ঘটনা শোন !

সে দিন স্কুলে দীপ্তিদির সংস্কৃত ক্লাশ। সাংঘাতিক দিন। গোটা তদ্ধিত প্রত্যয় পড়া আছে। এখনি ধরবেন দীপ্তিদি এসে। কড়া লোক উনি, একটু ভুলে রক্ষা নেই। সাড়া মুখস্তের ব্যাপার আজকের পড়াটা। সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেছে। হঠাৎ আরতি নিঃশব্দে নিজের জায়গা থেকে উঠে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিল, শাদাচকের মস্ত অক্ষরে,—

এ তদ্ধিত-ভব-সাগর তরিবে কে ?

হরে মুরারে, হরে মুরারে !

সকলের মনের কথা। হেসে গড়িয়ে পড়ল তারা। হাসাহাসির মধ্যে কখন দীপ্তিদি এসে পড়েছেন খেয়াল নেই। লেখাটা মুছে দেবার সময় পাওয়া গেল না। 'দূর্গা', নাম জপে যে যার জায়গায় বসল।

কঠিন স্বরে দীপ্তিদি প্রশ্ন করলেন, "কে লিখেছে ?" আরতি উঠে দাঁড়াল। ভয় পেলেও লুকিয়ে থাকাটা ওর কাছে কাপুরুষতা। মুখটা কাঁচুমাচু বেচারীর, বন্ধুদের বুক দুরুদুরু। দেখা গেল, দীপ্তিদির ঠোঁট কাঁপছে—বকুনীতে নয়, চাপা হাসিতে। হেসেই ফেললেন তিনি। শুধু তাই নয়, সে দিনের মত তদ্ধিত প্রত্যয় মাপ হয়ে গেল।

১লা এপ্রেল, এপ্রেল ফুলের দিন। সারা দিন ধরে

মঞ্জুরা বন্ধুদের 'এপ্রেল্ ফুল্' করেছে বোকা বানিয়ে। শিক্ষয়িত্রী ডাকছেন বলে কাউকে মিছেমিছি কমন্-রুমে পাঠিয়ে দিয়েছে। কারুর বা খাতা-পেন্সিল লুকিয়ে নাজেহাল করেছে। এখন শেষ ঘণ্টা—মিস্ কারস্ওয়েল ব্যায়াম শেখাবেন। কলঘরের পাশে সরু লাল রাস্তা ধরে মেয়েরা হলঘরের দিকে যাচ্ছে। রাস্তার একপাশে পাকা জল-চলাচলের চওড়া নর্দ্দমা। অনেক মেয়ে তাড়াতাড়িতে পা পিছলে পড়ে যেত। কলঘরের সামনে একটা মোটা জামরুল গাছ। অনেক ছাত্রীর দৌড়তে যেয়ে মাথা ঠুকে যেত, তাই পরে কেটে ফেলা হয়েছিল। চন্দ্রা মঞ্জুর পিঠে হাত রেখে চলেছে, অন্যপাশে নন্দিনী। পেছনে মেয়েরা আসছে হাসতে হাসতে। মঞ্জু অগ্রণী হয়ে আজ বিস্তর 'এপ্রেল্ ফুল্' করেছে।

হলঘরে মিস্ কারস্ওয়েল দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন—বেঁটে-খাটো মানুষ, পোক্ত ধরণের। পায়ে শাদা কেডস্, শাদা মোজা। ছাত্রীদেরও ব্যায়ামে কেডস্ পরে আসতে হ'ত। মিস্ কারস্ওয়েল মঞ্জুকে এক নজর দেখে নিয়ে হেসে উঠলেন, "কে করেছে?"

চন্দ্রা স্বীকার করল সে করেছে। মঞ্জু অবাক! কি হয়েছে তার? সবাই এত হাসছে কেন? শেষে তার পিঠ থেকে এককুড়ি কাগজ আলপিনগাঁথা খুলে দেখানো হ'ল। প্রকাণ্ড হরফে লেখা: Sale, Half price. (অর্দ্ধেক দামে বিক্রী)! হলঘরে ব্যায়ামে আসতে আসতে পিঠে এঁটে দিয়ে মঞ্জুকেই এপ্রেলফুল্ করা হয়েছিল।

নিনির সম্পর্কে বোন, নীচু ক্লাশের ডলুর বিষয়ে এ সময়ে একটা মজার গল্প রটে' গেল। সবাই ডলুকে 'গেষ্ট' (অতিথি) বলে ক্ষ্যাপাত। অতিথি বললে কেউ ক্ষ্যাপে কেন? ক্ষ্যাপাবারই বা আছে কি এতে? যদি জানতে চাও, তবে একটি গল্প শোন। নিনি বলে দিয়েছিল ক্লাশের বন্ধুদের। নিনিদের বাড়ীতে একজন মামা এসেছিলেন অতিথি হয়ে কিছুদিন থাকতে। সকালে চায়ের টেবিলে সবাই পেত আধসেদ্ধ ডিম, স্বাস্থ্যের খাতিরে। মামাকে দেওয়া হ'ত শক্ত ডিমসেদ্ধ। আধসেদ্ধ ডিম ত খেতে ভাল লাগেনা। ডলু নিনির বড়দি রুবিদির কাছে আবদার ধরল, "আমিও খাব অমনি শক্ত ডিম। কল্যাণ মামা যে খায়?" রুবিদি বোঝালেন, "কল্যাণ মামা যে গেস্ট, তাই শক্ত ডিমসেদ্ধ খান।" এর পরে যেই ডলুকে ইংরাজি পড়া ধরতে Guest শব্দের মানে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, ডলু অনায়াসে বলে দিল, "গেস্ট মানে যিনি শক্ত ডিম সেদ্ধ খান।"

কখন তারা অন্য মেয়েদের নিয়ে একটু আধটু ঠাট্টা-তামসা করত, যে ব্যবহার বেশী গড়ালে 'বুলি' (Bully) বলা চলে। কিন্তু, এদের ক্ষেত্রে বেশী গড়াত না। প্রত্যেকবার মঞ্জু প্রতিবাদ করত। অনেক, অনেকদিন আগে নীচু ক্লাশে সে যখন ভর্ত্তি হয়েছিল, তখন ছোট নূতন মেয়ে পেয়ে বড় ও পুরণো মেয়েরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, ক্ষেপিয়ে, ভয় দেখিয়ে ওর ওপর একপালা অত্যাচার করে নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু,

ভাগ্যক্রমে পড়াশোনায় ভাল হয়ে যাওয়াতে সে চট্ করে শিক্ষয়িত্রীদের সুনজরে পড়ে গিয়েছিল। মেয়েদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে গেল। দুঃখের দিন ফুরিয়ে গেল তার, কিন্তু দুঃখের স্মৃতি রয়ে গেল। তাই ছাত্রী-জীবনে মঞ্জু কখন কোন মেয়েকে নিয়ে খেলাচ্ছলেও হাসাহাসি করতে পারেনি। যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে চিরদিন সে দাঁড়িয়েছে। মনে করেছে, এ-ও রাজা আর্থারের নাইটের কাজ। যে মেয়ে প্রথম স্কুলে আসে, সে ত অচেনার ভয়ে অস্থির থাকে। তাকে নিজেদের মধ্যে আদর করে ডেকে নেওয়া উচিত, না তার ছোটখাট খুঁৎ ধরে তাকে পীড়ন করা উচিত ? সব স্কুলে এ রকমটি হয়। যারা এইভাবে অন্যকে কষ্ট দেয়, তাদের ইংরাজিতে 'ব্যুলি' বলে। যদি তোমাদের কারুর অভ্যাসটি থাকে, ছেড়ে দিও।

নানা উপায়ে অসহায় মেয়েদের জ্বালাতন করা হ'ত। এ স্কুলে গানের আদর ছিল। যারা ভাল গাইয়ে, তাদের ডেকে নিয়ে শিক্ষয়িত্রী ও বড় মেয়েরা মাঠে বা ঘরে বসে গান শুনতেন কেউ গান জানলে তার কদর হ'ত ঢের. টুনুও আজকাল বেশ নাম করেছিল গান শুনিয়ে। যারা খারাপ গান গাইত, 'ব্যুলিরা' তাকে অনুরোধ করত, "ভাই, একখানা গান শোনাও না। তুমি যা ভাল গাও!" বোকা মেয়ে সত্যি ভেবে গান আরম্ভ করে দিত। বেসুরো বাজে গান শুনে 'ব্যুলিরা' গোপনে হাসতো, গা-টেপাটেপি করত। কিন্তু মুখে 'বাঃ বাঃ' বলে

বাহবা দিয়ে যেত। ফলে, সে মেয়েটি হাস্যাস্পদ হলেও কিছু বুঝে উঠতে পারত না।

পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়েও বিদ্রূপ চলত। কাপড় ঠিক মত পড়তে না পারলে অন্যেরা বিনীত ভাব দেখিয়ে তার কাছে যেয়ে বলত, "ভাই, তুমি কি সুন্দর শাড়ী পর! শিখিয়ে দেবে?" ছেঁড়া কাপড় জামা 'দেখি-দেখি' ব'লে হাত দিয়ে টেনে ছেঁড়াও চলন ছিল। বইখাতা লুকিয়ে রাখা, জিনিষপত্র ফেলে-ছড়িয়ে দেওয়া বিনা কারণে কাউকে 'চোর' প্রমাণ করা, যে দোষ সে করেনি, সে দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে নাজেহাল করা—এসব যন্ত্রণা বহুকেই সইতে হয়েছে। নকল করে ভ্যাংচানো, খুঁৎ নিয়ে হাসাহাসি, দেখতে অথবা লেখাপড়াতে খারাপ হ'লে বিদ্রূপ—এ ত নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ প্রবৃত্তি ছেলে-স্কুলে ভীষণভাবে দেখা দেয়—মারামারি, বেদম প্রহার ছেলেদের ব্যুলিত্বে বিশেষত্ব। মেয়ে-স্কুলে মারধোর বিহীন অপেক্ষাকৃত নিরীহ ব্যুলিগিরি হয়। যারা এমন করে তারা নিজেরা মোটে নিখুঁত নয়। তাদের পেছনে একটি দল থাকে—দলের সায় পাবার সুযোগ তারা নেয়। মনের নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি এটি। কিন্তু, একজন নিষ্ঠুর হ'লে বা সবাই হ'বে কেন? ব্যুলিকে রুখে দাঁড়ালে ব্যুলি জব্দ হয়। সব ব্যুলিই কাপুরুষ, মনে রেখ। তোমাকে যদি ব্যুলি করা হয়, তুমি রুখে দাঁড়িও। একজন নিরপরাধ মেয়েকে যদি ব্যুলি করা হয়, অবশ্য তুমি বাধা দিও। তোমার মনে ভয় না থাকলে ভয় কি? তুমি ত ভাল কাজ করেছ।

একবার মঞ্জু-আরতি নিছক মজার মতলবে একজন নীচু ক্লাশের মেয়েকে কিছুদিন ক্ষ্যাপায়। শাস্তি পেয়েছিল তারা। না, কেউ শাস্তি দেয়নি। নিজের মনে শাস্তি। দ্বিতীয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে উঠেছে মঞ্জুরা। চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছে এক গেঁয়ো মেয়ে। মাথায় ঢলঢলে, খোঁপা রুখু চুলের, কাল জালে ঘেরা। ঘরে তৈরি বুকে-কুঁচি আধময়লা লংক্লথের ফ্রক। যেমন বেখাপ্পা পোষাক, তেমনি বেঢপ চেহারা, চলা-ফেরা গেঁয়ো-গেঁয়ো। ইংরেজিতে এদের 'Country cousin' বলে। ওকে দেখে প্রথম শ্রেণীর মেয়েরা আমোদ পে'ল। নাম-টাম জিজ্ঞাসা করে আলাপ জ্বালাতে যেতে মেয়েটি গম্ভীর ভাবে একটি লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। তখন পরীক্ষার পরে, পড়াশোনা নূতন শ্রেণীতে আরম্ভ হয়নি। নূতন মেয়েটির নাম পারুল। কোন মেয়ে কোন ক্লাশে পড়ে তা সে জানতো না। পারুল মঞ্জুদের বুঝালো যে, এমন করে মাঠে-মাঠে ঘুরে না বেড়িয়ে পড়াশোনায় মন দেওয়া উচিত। ক্লাশ হোক বা না হোক, সে বাড়ীতে নিয়মিত পড়ে যাচ্ছে বইগুলো। সকলেরই তাই করা কর্ত্তব্য।—"তোমরা কোন ক্লাশে পড় গো?"—

মঞ্জু এবারেও প্রথম হয়েছিল। সে উত্তর দিল, "আমরা ভাই, এবারে পাশ করতে পারিনি। এত বয়েস আমাদের। কিন্তু, পড়ি ক্লাশ ফাইভে। তুমি কত ভাল! আমাদের মত খারাপ মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে তো?" মেয়েটি উদার উত্তর দিল "তাতে কি? একদিনে সবাই ভাল হয় না। তোমরা যে

খালি খেলা করে ব্যাড়াও।” “তুমি আমাদের পড়াবে, বই আনব আমরা?” নন্দিনী, রেণুঘোষ জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটি রাজি হ'ল, “মাঝে মাঝে পারি, রোজ পারব না। আমার পড়ার ক্ষেতি হ'বে।” আরতি বলল, “আমরা তোমার কাছে রোজ আসব। আমাদের একটু উপদেশ দিও-টিও। কিন্তু, দেখ ভাই, এ কথা কাউকে বলনা যেন, আমরা লজ্জা পাব।” মেয়েটি ঘাড় হেলাল। তারপরে কয়েকটি দিন মজার খেলা চলল। স্কুলে 'Sunday School' বা নীতি বিদ্যালয় বসত রবিবারে। সমাজ থেকে করানো হত'। এরা কেউ কোনোদিন সে স্কুলে যেতনা। অত 'ধম্মো' এদের সইত না। স্কুলেও নানা নীতি-কথা থাকত। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা' পড়ানো হোত। তা-ও এদের ভাল লাগেনি। ব্রাহ্ম ও হিন্দু মেয়েরা মালার মত জড়াজড়ি করে স্কুলে পড়ত। ধর্ম্ম নিয়ে কচ্‌কচি তাদের কাছে ভণ্ডামী বলে মনে হোত। নূতন যুগের মানুষ তারা,.নূতন যুগের অনাগত আলো তাদের মুখে-চোখে পড়েছে। সে যুগে একটিই ধর্ম্ম আছে—মানবতার ধর্ম্ম। যাই হোক, প্রথম শ্রেণীর মেয়েরা এতদিন যত নীতিসার ফাঁকি দিয়েছে এখন সুদে আসলে মিটিয়ে দিতে হ'ল ওই গেঁয়ো মেয়ের কাছে। দীর্ঘ বক্তৃতা, নানা নীতি-উপদেশ শুনল তারা দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে। এরা পারুলকে 'লেকচারার' অর্থাৎ বক্তা নাম দিয়ে হাসাহাসি করত।

কতদিন মিথ্যার খেলা চলত জানি না। বোকা-সোকা

লেকচারার বুঝত না মঞ্জুর দল সবচেয়ে উঁচুতে পড়ে, এরা নামজাদা ভাল মেয়ে। হঠাৎ একদিন মাঠে বেড়াতে বেড়াতে কথায় কথায় লেকচারার বলল, "আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে। শিগ্‌গির বড় ডাক্তার দেখান হ'বে।" "কেন, কেন?"

"রোজ রাত্রে আমার জ্বর হয়।"

লেকচারারের সুর করুণ। সত্যিই তো! মুখে তার একটা হলুদ আভা পড়েছে, রোগা হয়ে গেছে খানিকটা। চোখের নীচে কালি, ক্লান্ত ভাবগতিক। চলাফেরাও যেন পারে না, অতিকষ্টে শরীরটাকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বেমানান পোষাক ঢিলে হয়েছে আরও। কণ্ঠার হাড়, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে। কেউ লক্ষ্য করেনি। রুগ্ন মেয়েটাকে নিয়ে তামাসার বান ডাকিয়ে চলেছিল তারা। কারুর সেদিন ঠাট্টা-তামাসা ভাল লাগল না। ওরা চলে এল দূরে।

"না ভাই, ভাল লাগছে না। বেচারীর অসুখ। ওকে নিয়ে হাসাহাসি করব না আর।"

সত্যি কথা প্রকাশ করে তারা লেকচারারের কাছে ক্ষমা চাইল। তারা মিথ্যা নাম বলেছিল। তাদের আসল নাম শুনে লেকচারার অভিভূত হয়ে পড়ল। স্কুলে নাম করা মাত্র তাদের চেনা যেত। "আপনারা কিছু মনে করবেন না।" লেকচারার বলল।

"আমাদের তুমি-ই ব'ল। আমরা তোমার বন্ধু থাকব

চিরকাল। লেকচারার ও তাদের মধ্যে সস্নেহ প্রীতি আগাগোড়া ছিল। হাসি-ঠাট্টা হলেও মিথ্যার ওপর দীর্ঘদিন কিছু দাঁড় করান উচিত নয়। মিথ্যার ভিৎ ভেঙ্গে বাড়ী খসে পড়ে। মনোকষ্ট লাভ হয় কেবল।

ছোট ক্লাশের সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়েদের নিয়ে আদরে তাদের মাথা গরম করে বড় মেয়েরা সময় কাটাত। এক এক জন একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াত, খেলা দিত, আদর করত। ফলে সে মেয়েটি নিজের বয়সী মেয়েদের সঙ্গ পেত না, খেলাধূলোর সুযোগ পেত না। বড়দের ভালবাসা অত্যাচার হয়ে দাঁড়াত। তার বন্ধুরা আবার তার এতটা আদর দেখে হিংসে করত, নিজেরা দুঃখ পেত ওদের কেউ ভালবাসছে না বলে। পরে সেই আদরিণী মেয়ে বয়স বাড়লে দেখত আর অত ভাল কেউ তাকে ত বাসছে না। তখন সে মুষড়ে পড়তো। এসব কুফল জানা ছিল মঞ্জুর। তবু একটি বাচ্চা মেয়ে, 'মনেকা' নাম, তাকে দিনকত আদর দিত মঞ্জু। চোখদুটি ভারী সুন্দর ছিল। কোলে নিয়ে বেড়াত। কিন্তু, এ-ব্যবহার চঞ্চল মঞ্জুর সাময়িক ঘটনা।

ছোট মেয়েরা আবার কেউ কেউ বড় মেয়েদের নিয়ে অত্যন্ত ন্যাকামি করত। পেছু পেছু ঘোরা, গায়ে পড়া, দেখলে লজ্জার ভান করে হাসা। অনেক বড় মেয়ে এতে গর্ব্ব বোধ করত, "দেখ আমার কত অ্যাডমায়ারার!" কিন্তু, অনেকে মহা বিরক্ত হ'ত। একদিন মঞ্জু মাঠে বসে

গল্প করছে বন্ধুদের সঙ্গে, এমন সময়ে নীচু ক্লাশের এক ফ্রক-পরা মেয়ে এসে ওর হাত ধরে টানাটানি, পিঠের উপর লাফালাফি, 'মঞ্জুদি, মঞ্জুদি' ডাকাডাকি করে অস্থির করে তুলল। মঞ্জু বিরক্ত হয়ে বলল, "এমন কি কেউ নেই একে সরিয়ে দেয় ?"

অমনি মিনতি কোমরে হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে শাসাল,—"ওহে খুকী, ভাল চাও ত সরে পর। নইলে বল-প্রয়োগ করব।"

বলপ্রয়োগ কথাটা না বুঝলেও মিনতির মুখের ভাব দেখে খুকী সুড়সুড় করে পালাল।

এ-ধরণের ন্যাকামী সামান্য কথা। ন্যাকামী চরমে উঠত। টীচার বা বড় মেয়েকে উদ্দেশ করে কবিতা লেখা, বন্ধুদের মধ্যে প্রেমপত্রের মত চিঠি, মান-অভিমান। যেন স্বামী-স্ত্রী! দেখলে গা জ্বালা করে। বোর্ডিংএর মেয়েদের এই মারাত্মক অভ্যাস ছিল বেশী। একজন মেয়ে বন্ধু-মেয়েকে চিঠি লিখেছিল "তোমার হৃদয়-বৃন্ত থেকে পদ্মের মত আমাকে ছিঁড়ে ফেলো না।" ন্যাকামী দেখ! কদাচিৎ কোন শিক্ষয়িত্রী বা বড় মেয়ে আবার নিজের প্রতি ন্যাকামীকে একটু প্রশ্রয়ই দিতেন। ভুল করতেন তাঁরা। স্কুল-জীবন কৈশোর-দিনের মাধুর্য্য ও স্বপ্ন দিয়ে গড়া। বুড়োটে ন্যাকামীর স্থান নেই সেখানে। যৌবন ত পড়েই আছে সামনে। তা ছাড়া, মেয়ে মেয়েতে এ-ভাব ত স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক।

বন্ধুর মত প্রিয় কেউ নেই, সে বন্ধুকে বন্ধুই রেখ। ন্যাকামীর বেড়া জালে সুন্দর সম্বন্ধকে বিকৃত করবার চেষ্টা ক'র না। প্রেম ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তির সময় পড়ে আছে—সম্মুখে এগিয়ে চললে ঠিক সময়ে পাওয়া যাবে। যে সময়ের যা। এই জন্য অল্প বয়সে নিছক মেয়েদের মধ্যে কাটানো বহু ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। যথাযোগ্য চললে সহশিক্ষা অল্প বয়সে ধরান উচিত। ছেলে—মেয়ে ভাইবোন। ভাই-বোনের মত মিশবে। নিজের ভাই, ক্লাশের ছেলে, পাড়ার ছেলে এক। মনে মনে 'ভাই' বলে ডাকতে হয়।

মিস বাসু যেমন এ ধরণের ন্যাকামী পছন্দ করতেন না, তেমনি অল্পবয়সে বয়স্কদের মত ছাত্রীরা যে বিলাসিতা করে, তাও পছন্দ করতেন না। সাজপোষাক অতিরিক্ত হয়ে গেলে অসন্তুষ্টি বোধ করতেন। তিনি পরিষ্কার সাজতে শেখাতেন, আগেই বলেছি। ঊষাদি বলে একজন শিক্ষয়িত্রী কিছুদিন মঞ্জুদের ইংরেজি পড়াতেন। পড়া চমৎকার বোঝাতেন, নিয়ম-কানুনে কড়া ছিলেন। মিস বাসুর মত তিনিও মেয়েদের সাজের দিকে চোখ রাখতেন। জাঁকজমক দেখলে বিরক্ত হয়ে সংশোধন করতেন। এ সময়ে মঞ্জুরা বড় হচ্ছে, নানা জায়গায় যাচ্ছে, বাড়ীতেও বিবিধ ফ্যাশান দেখছে। উঁচু ক্লাশের মেয়ে-দের একটু সাজগোজের ইচ্ছা স্বাভাবিক। তবে কপালে টিপ, চোখে কাজল, হাতে-গলায় কাঁচের গয়না পরে এরা কোনদিন সাজত না। মুখেচোখে স্নো-পাউডারের প্রলেপ মাখিয়ে

বড়দের অনুকরণে চলা-ফেরা এদের কাছে লজ্জার বিষয় ছিল। তবু বয়সের ধর্ম্ম। উঁচু ক্লাশে বিশেষতঃ মঞ্জুদের ক্লাশে একটা সৌখিনতার চাপা স্রোত বয়ে যেত। আধুনিক কাট-ছাঁটের জামা, মিহি শাড়ী, লম্বা নখ রাখা, চুল সামনে কেটে 'লক্‌স্' ঝোলান, মেমী জুতো এসব তারা খুব চালাত। চুলে চওড়া ফিতের প্রজাপতি বাঁধা হত মিসবাসুর অপছন্দ সত্ত্বেও। কিন্তু শাসন-বারণে ফল হয়েছিল। যখন ফ্যাশনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার কথা, তখন মেয়েরা সংযত হ'তে শিখল। ঠোঁটে-গালে রং মাখা, নির্লজ্জ সাজ ছাত্রীজীবনে করতে নেই এ শিক্ষা মঞ্জুরা গ্রহণ করেছিল।

স্কুল থেকে যে বিলাসিতা দমন করতে চেষ্টা করতেন অনেক বাচ্চা মেয়েকে আবার বাড়ী থেকে সেই পথে টানত। বাচ্চাদের পুতুলের মত অতি বেশী সাজিয়ে দেওয়ার দোষ তাদের বাড়ীর লোকেরা অবশ্য বুঝতেন না। অল্প বয়সে বেশী ফ্যাশন মনে দেমাক আনে, শাদাসিধে সহপাঠিনীদের দেখে অবজ্ঞা আসে। বিলাসিতা, বাবুগিরিতে শিশুকাল থেকে যদি পোক্ত করা হয়, তা'হলে শিশু বড় হয়ে বাইরের আড়ম্বরকে যদি একমাত্র আদৃত বস্তু মনে করে তবে দোষ কাকে দেব? পুতুলের সাজে আড়ষ্ট-ভাবে চলাফেরা, জামা কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে বলে, শরীরের মনের স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে। ওই শিক্ষা বড় হয়ে সমাজের প্রজাপতি হ'তে শেখায় খালি। সে সব মেয়ে বিশেষ কিছু করতে পারে না।

এই স্কুলে বাচ্চাদের জন্য একটি আলাদা বিভাগ ছিল। মন্তেসেরির প্রথায় কিণ্ডারগার্ডেন শিক্ষা বাঙালী স্কুলের মধ্যে এ স্কুলে প্রথম চালান হয়। বাচ্চাদের আলাদা বাড়ী ছিল। ছোট ছোট টেবিল-চেয়ার, কত রকম খেলনা! খেলার মধ্যে দিয়ে পড়া হত। ঘুম পাড়াবার ঘণ্টা ছিল। বিছানা পেতে পাখার নীচে শুয়ে ঘুমোত বাচ্চারা। ঘর অন্ধকার করে দিত। বাচ্চাদের ঝক্‌ঝকে-চক্‌চকে জিনিষপত্র দেখে সাধারণ বিভাগের মেয়েদের হিংসা হ'ত। আহা, আবার ছোট হয়ে যাইনা কেন? ওরা কত সুবিধা পাচ্ছে! কচিমনে কোন চাপ দেওয়া হচ্ছে না। নিজস্ব জিনিষপত্র আছে ওদের। নিজেকে মূল্য দিতে শিখছে ওরা। পীড়ন করছে না কেউ। শাসন, চোখ রাঙানী, শাস্তি পাপী-তাপীর জন্য, শিক্ষা বিভাগের জিনিষ হওয়া উচিত নয়। আশা-আনন্দে যে কচি মন পাখা মেলছে বাইরের পৃথিবীর আকাশে, সে মন রূঢ়তার ছোঁয়া পেলে কুঁকড়ে মরে যাবে। খেলার ভেতর দিয়ে পড়া এলে শেখা হবে সহজ। অসহায় শিশুর মন জ্ঞান-সমুদ্রের অগাধ এবং লবণাক্ত জলে পড়ে হাবুডুবু খাবে না। মিস ভকীল নামে একজন পার্শী ভদ্রমহিলা বাচ্চা বিভাগের হাল ধরেছিলেন। চেহারা ভাল, পোষাক ভাল। বিদেশ থেকে বাচ্চাদের পড়ানো শিখে আসতে হ'ত তখন। স্কুল-বিভাগের নলিনী রাহা শিখে এসেছিলেন। সুনিপুণ ভাবে চালাতেন কাজ তিনি।

সেদিন মঞ্জুর গতিশীল মনে এ ধরণের কথা তোলপাড় করত। কেউ বুঝিয়ে না দিলেও সে আপনি বুঝেছিল, ছোটদের শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া উচিত সকল জায়গায়।

যাক সজ্জার কথায় ফিরি। বাচ্চাদের বিভাগে একটি বাচ্চা মেয়ে আসত। ভা-রী সুন্দর চুল। প্রত্যেকটি থোপা কোঁকড়া। আলাদা ঝুলছে পিঠে। মঞ্জুরা ত দেখে মোহিত। "এমন চুল ত দেখিনি।" সবাই একবার তার মাথায় হাত বোলায়। শেষাশেষি প্রকাশ পেল আদুরে মেয়েটির মা রোজ ওকে চুলের দোকানে নিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে চুল কুঁকড়িয়ে আনেন। স্কুল থেকে নিষেধ করে দেওয়া হ'ল।

অতি নাচানাচি স্কুলে প্রশ্রয় দিতেন না মিস বাসু ; দেওয়া উচিতও নয়। কয়েকটি মেয়ে ছিল প্রায় সব বিষয়ে চমৎকার। একটি সুন্দর মেয়ে বোর্ডিং-এ থাকত, তাকে সকলে 'মিষ্টু' বলে ডাকত। পড়াশোনা, নাচগান সব কিছুতে ভাল, মিষ্টি তার সব কিছু। ক্রমাগত প্রতিটি উৎসবে ওকে নিয়ে টানাটানি চলত। অতি আহ্লাদে, অতি নাচ-গানে মাথা বিগড়ে গেল। পড়াশোনায় খারাপ হয়ে যেতে লাগল সেই মিষ্টু। শেষে মিস বাসু তাকে কোন উৎসবে ভূমিকা নিতে নিষেধ করে দিলেন। আবার সামলে নিয়ে পড়াশোনায় মাথা দিল ও। নাচানাচি হৈ-চৈ নিয়ে যারা থাকত পতন হোত তাদের।

এ সময়ে নানা সখের অভিনয়ের দল ও গানের প্রতিষ্ঠান 'চ্যারিটি' অভিনয়ে বা সখের অভিনয়ে মেয়ে খুঁজে বেড়াত। এ স্কুলের কেউ কেউ মেয়ে ও সব দলে যোগ দিয়ে অভিনয় বা নাচ গান করত বাইরে। মিসবাস্থ জানতে পারলে বিরক্ত হতেন। তাই দু'একবার সুযোগ পেয়ে সাধাসাধি সত্ত্বেও মঞ্জু এসব দলে যায় নি। বাইরে, তার বাড়ী ও স্কুলের গণ্ডির সীমা পার হ'য়ে যে একটি মস্ত অচেনা জগৎ ছিল, সে জগতে মঞ্জুর লোভ যতটা না ছিল কৌতূহল ছিল দশগুণ। তবু ছোট স্কুলকেই প্রাধান্য দিত ও। টুনু যেত ক্রমাগত। অবশ্য টুনু অনেক বেশী সুযোগ ও সাধাসাধি পেত। ক্লাশের রেণু ঘোষও যেত। অনেককে যেতে হ'ত পীড়াপীড়িতে। কিন্তু, পুরুষ-মেয়ে মেশান সে বাইরের জগৎ। রং—পোষাকের বাহার। বাজে কথা, দম্ভের বাড়াবাড়ি। ওখানে যেয়ে মাথা গরম হয় খালি। স্কুলের ছোট মেয়েদের ওদলে যোগ না দেওয়াইভাল।

হাসির কথা শুনতে ভালবাস, কত লিখব? যে সব আনন্দের দিনে প্রতিমুহূর্ত্তে হাসির বন্যা বেয়ে যাচ্ছে, সে সব দিনের হাসি কি কথার জালে ধরা যায়? মাঝে মাঝে কান্নাও মিশত হাসিতে। পরীক্ষাতে কম নাম্বার পাওয়া, প্রোমোশন না পাওয়া, শিক্ষয়িত্রীদের বকুনী, শাস্তি, আঘাত পাওয়া, বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া—সমস্ত কান্না মিশত হাসির বন্যাস্রোতে। আলো-আঁধারী মধুর দিন। একবার চলে গেলে ফিরে আসে না—যত না কেন ফেরাবার জন্য সাধা যায়।

প্রোমোশনের দিন উপলক্ষ্য করে ছেলেবেলায় মঞ্জু একটি প্যারোডি অর্থাৎ লালিকা লিখেছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতভিক্ষা' নামে কবিতা আছে—

"একি শুনি আজ আমাদের দেশে
এ-আনন্দ-ধ্বনি কেন রে হয়,
বৃটিশ শাসিত ভারত-ভিতরে
কেন সবে আজ বলিছে জয় ?"

এরই অনুকরণে মঞ্জু লিখেছিল :—

এ কি শুনি আজ আমাদের স্কুলে
এত চেঁচামেচি কেন রে হয় ?
টিচার-শাসিত ক্লাশের ভিতরে
কেন সবে আজ বলিছে জয় ?
বলছে সকলে পেয়ে প্রমোশান,
'এতদিনে সব বাঁচিল পরাণ।'
প্রমোশন-প্রাপ্ত মেয়েদের দল
আনন্দে কেহ বা নাচিছে তায়।
এ হেন সময়ে হাতে লয়ে খাতা
এলেন মোদের ভাগ্যকুল-ধাতা ;
ক্লাশেতে ক্লাশেতে কত শত মেয়ে
দাঁড়ায়ে রহিল স্থানুর প্রায়।
পড়িছেন নাম, কেহ বা কম্পিত,

কেহ হরষিত, কেহ বা শঙ্কিত,
কেহ বা কাঁদিছে, কেহ বা হাসিছে,
কেহ বা গাহিছে, জয়, জয়, জয়।
বোর্ডিং হইতে স্কুল বাড়ী আজি
কেন রে এমন হাসিকান্না-ময় ?

ছোট মেয়ের লেখা। মন্দ নয়, কি বল ?

তেরো

এইবার মিস বাসু ও শিক্ষয়িত্রীদের বিষয়ে কিছু শোন। মিস বাসু ও তাঁদের সবাইকে আগেই চিনিয়েছি। স্বভাবের পরিচয়ও পাওয়া গেছে। গোটা স্কুলটির কর্ণধার মিস বাসু, দোর্দ্দণ্ড তাঁর প্রতাপ।

মিস বাসুর কথা যখনই ভাবত মঞ্জু তখন তার মনে আসত পুরণোকালের কয়েকটি নারীর কথা—যাঁদের বলা যায়, 'Empire Builder', অর্থাৎ একটা সাম্রাজ্যের গঠন-মূলক কাজ বাঁধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে চালিয়ে যাবার শক্তি ছিল তাঁদের। আধুনিক বেশে সজ্জিতা, পাউডার-রুজ-মাখা মিস বাসু কিন্তু সেই সব দৃঢ়চেতা কঠিনমূর্ত্তি মহিলাদের সগোত্র ছিলেন। স্কুলটি হাতে পেয়েই মনের মত নূতন রূপে তাকে গড়বার চেষ্টা করেছিলেন তিনি প্রাণপণে। স্কুল যেন তাঁর

ধ্যান-জ্ঞান ছিল। কি হ'লে দশের মধ্যে স্কুলের নাম হবে, কি করলে মেয়েরা সব দিকে উন্নতি করে যাবে, এ চেষ্টায় তিনি আহার-নিদ্রা ভুলে যেতেন। নিজেকে স্কুলের মধ্যে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কেউ যদি স্কুলের বা মেয়েদের একটু নিন্দা করত, গায়ে বাজত তাঁর। যেখানে যেটি ভাল দেখতেন ওঁর স্কুলে সেটি চাই। দোহারা শরীর। অসম্ভব উত্তম না থাকলে হয় ত মোটা হয়ে পড়তেন। সব সময়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তাঁর মধ্যে যেন কি একটা অশান্ত আত্মা ঠেলে ঠেলে তাঁকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। চঞ্চল মনে হাজার পরিকল্পনা আসছে। তাই নিয়ে গোটা স্কুলকে মাতিয়ে তুলছেন। কখন সে সব পরিকল্পনা কার্য্যকরী হচ্ছে, কখন হচ্ছে না।

মিস বাসুকে সকলে কত ভুল বুঝেছে, তিনিও সকলকে কত ভুল বুঝেছেন। স্বভাবে ধীর যারা, বিশেষত্ব নেই যাদের, মিস বাসুর ছকে তাদের স্থান ছিল না। কোনরূপ শিথিলতা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর ধারণা, তাঁর ভাবনার সঙ্গে পা ফেলে যারা ছুটে চলতে পারত, সেই সব মেয়ে তাঁর আদর্শে বড় হ'বার সুযোগ পেয়েছে। যারা পিছিয়ে থাকত, তাদের জন্য চেষ্টা করলেও সে চেষ্টায় দরদের আমেজ লাগত না মিস বাসুর। চোস্ত-পালিশ লোক তিনি, শিক্ষিত প্রগতিশীল মন তাঁর; আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী এনে এনে স্কুলটিকে প্রথম শ্রেণীর স্কুলে দাঁড় করিয়েছেন। কোথাও ঢিলে-ঢালা ভাব নেই। কিন্তু এই যান্ত্রিক শৃঙ্খলাতে যারা তাল রাখতে

পারত না, তাদের প্রকৃত গলদ কোথায় সে কথা কখন কোন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ভেবে দেখেন না। মিস বাসুর মধ্যে একটি গঠনমূলক প্রতিভা ছিল। তার ফলে অসহিষ্ণু হতেন তিনি, বিরক্তি-ক্রোধ দেখা দিত। নিজের কল্পনা কাজে খাটাতে পীড়ন করতেন সকলকে। তাই অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী বা মেয়েদের কাছে তিনি অপ্রিয় হতেন প্রায়ই। পাঁচ মিনিট বাদে বাদে গতিশীল মনে নানা নূতন ধারণা গজিয়ে উঠত—তখন সব ভুলে ছাত্রী-শিক্ষয়িত্রী সকলকে প্রাণপাত পরিশ্রমে যুতে সেগুলো করিয়ে নিতেন। নিজে ত খাটতেন সকলের চেয়ে। বিরুদ্ধ দলের মতামতও কাটিয়ে উঠতেন।

স্কুলের তহবিলে টাকা তুলতে মিস বাসু মান কেন প্রাণও বিসর্জ্জন দিতে পারতেন। এই, খাতা-পেন্সিল ইত্যাদির মনোহারী দোকান খুল্লেন: মেয়েরা কিনবে। লাভ যাবে স্কুল-তহবিলে। ওই, সরবতের দোকান দিলেন জলখাবারের ঘণ্টায়: টাকা উঠবে। সেই, জামার কাপড় কিনে মেয়েদের দিয়ে সেলাই করিয়ে স্কুলে বিক্রী করলেন। লাভের টাকা ঘরে এল। চাঁদা চাওয়ার উৎপাত ঢের ছিল। তবু, কম খরচে অনেক সুবিধা পেত মেয়েরা। যে কোন ছোটখাট ব্যাপারেও মিস বাসু বিরাট ব্যস্ততায় অস্থির হয়ে উঠতেন। কঠিন সেজে শাসন করলেও বা মর্ম্মান্তিক কটু কথা বল্লেও মিস বাসুকে কোন অবিচার করতে দেখেনি মঞ্জু। গুণের আদর জানতেন তিনি। কিন্তু, হৃদয়ের

স্পর্শ ছিল কম। মেজাজ হঠাৎ বিগড়ে যেত কখন বা। কখন তিনি মাটীর মানুষ, সব কথা বলা চলে, কখন তিনি পাথরের মূর্ত্তি। তিনি যে অহরহ তাড়না করেছেন, নানা পরিকল্পনায় অস্থির করেছেন, তার সুফল যারা গ্রহণ করতে পেরেছে, যারা তাঁর ভাবনার সঙ্গে যোগ রেখে চলতে চেষ্টা করেছে, তারা জানে তাদের জীবনে তাঁর দান কতখানি। শৃঙ্খলা শিখেছে তারা, নানা দিকে গঠনমূলক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছে। সমস্ত গুণে পালিশ লেগেছে তাদের। পড়ার বইএর সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে কোনদিন ঝোঁক দেন নি মিস বাসু—জগতের জ্ঞানভাণ্ডার চোখের সামনে খুলে দিয়েছেন। যারা গ্রহণ করতে পেরেছে, তারা অপার কৃতজ্ঞতায় তাঁর ঋণ স্বীকার করবে।

মিস বাসু ছিলেন এম্পায়ার বিল্ডার—কোন রাজ্য, সাম্রাজ্য তিনি গড়েন নি সত্য। একটি ছোট স্কুলের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রাণশক্তি, উদ্যম নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়েছেন। সাম্রাজ্য গড়তে বৃহত্তর প্রতিভা লাগে। তবু মিস বাসুর কাজ কম মহৎ নয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে একটি শিক্ষালয়ের মূল্য যে অনেকখানি! জাতির মেরুদণ্ড নারী। মানুষ হিসাবে মেয়েদের গড়ে তুলেছেন তিনি। যদি তাঁর হাতের গড়া মেয়েদের মধ্যে একজনও মানুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখে, সে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাঁকে।

যে হৃদয়ের স্পর্শ মিস বাসু দিতে পারেননি, সেটা পাওয়া

যেত অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের কাছে। বিশেষতঃ করুণাদির কাছে। মিস বাসু ছিলেন ঝকঝকে পাথর, করুণাদি যেন পাথরে শ্যাওলার পাড়। নাম সার্থক হয়েছিল কোমল মনের গুণে।

তৃপ্তিদির কথা ভাবলে মঞ্জুর মনে হয়, আহা, যদি উনি লিখতেন! ব্যাঙ্গ ও হাস্যরস সংক্ষিপ্ত শাণিত রূপে প্রকাশ করতে পারতেন। ওই তাঁর চরিত্রের রূপ। কোথাও শাণিত ভাব লুকিয়ে ছিল।

রাণীদি—তাঁর মুখে সুষমা, হাসিতে শান্তি ছিল।

মেয়েদের প্রতি দরদী মন ছিল তাঁর।

চারুদি—মঞ্জু ভাবত ওঁর উচিত ছিল কোন দর্শনালয়ে পড়াশোনাতে ডুবে থাকা। অন্যমনস্ক, ভালমানুষ। কালুদি—ধারাল শিক্ষয়িত্রী। কিন্তু, বড় বকতেন অঙ্ক না পারলে। উপায় ছিল না তাঁর। একটুও অবহেলা করতেন না। অঙ্ক ছিল আবার মঞ্জুর যম। মিলিদি—তাঁর হাসির মাধুর্য্য এখনও মনে আছে। মিসেস পাত্র, কিরণ মাসীমা, নীহারদি, সুপ্রভাদি, মিস সেন, সান্ত্বনাদি, সাধনাদি, ব্যাঙদি, সুধাদি, ডলিদি—অনেকে, অনেকে। মণির মত একটি মালায় স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছেন তাঁরা।

এঁরা মেয়েদের ভালবাসতেন, ভুলত্রুটি শুধরে দিতেন, দোষ দেখলে তিরস্কার করতেন। মিস বাসু অবশ্য সর্ব্বদা এদের সঙ্গে ঠিক আদর্শ ভাল ব্যবহার করেন নি। তবু স্কুল চালাবার পক্ষে যা দরকারী, সেই সহযোগিতা ছিল প্রধান।

শিক্ষয়িত্রী ও অন্য শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে। কখনও এঁরা শিক্ষায় ফাঁকির বা পড়ায় গলদের ধার ধারতেন না! মিস বাসুর গঠনমূলক উদ্যমের এঁরা ছিলেন উপযুক্ত সেনাপতি। বিশেষ করে তৃপ্তিদি, কালুদি, রাণীদির গঠনমূলক প্রতিভার তুলনা ছিল না। এই একদল সজাগ শিক্ষয়িত্রী না থাকলে মিস বাসুর সমস্ত কাজই পণ্ড হ'ত। সারাদিন পরিশ্রমের পরেও বাড়তি কাজে আলস্য ছিল না তাঁদের, উৎসাহ কম ছিল না। মেয়েদের প্রতিটি উৎসবে যোগ দিতেন, সমস্ত চেষ্টায় হাসিমুখে সাহায্য করতেন। এঁদের জীবনের কেন্দ্র ছিল স্কুল ; অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী-দের সঙ্গে বন্ধুত্বে, মেয়েদের প্রতি স্নেহে জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এঁদের, শূন্যতার ফাঁক কোথাও ছিল না। কদাচিৎ দুই এক-জনের প্রকৃতি ছিল রুক্ষ, খিটখিটে, তাঁদের কথা আলাদা। এঁদের হাসিখুসী মুখ, সব কাজে উৎসাহ দেখলে বোঝা যেত, মিস বাসুর মত এঁরাও স্কুলের মধ্যে নিজেদেরকে মিশিয়ে দিয়েছেন। ছাত্রীবাসে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা পরিজনের অভাব বোধ করতেন না। স্কুল ছিল এঁদের ঘরবাড়ী; সাধারণ ঘরবাড়ীর চেয়ে অত্যন্ত বড়, এই যা। এমন একদল কর্ম্মী কই সহজে ত দেখা যায় না?

একটি উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর মূল্য আজ কত? মাসের সামান্য মাইনেটা নয়—অনেক বেশী। সেনাপতি তৈরি করবার মত যত্নে এক একটি শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলা উচিত, কারণ তাঁরা গড়বেন জাতির ভবিষ্যৎ।

প্রতি স্কুলে শিক্ষয়িত্রী-ছাত্রীর মধ্যে ভুলবোঝা দেখি। সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা বলব আমি।

শিক্ষয়িত্রীর মেজাজ রাখতে হয় মোটামুটী একটানা। 'ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট' মেজাজ দেখলে ছাত্রীরা চমকে যায়। বড়দের মনোজগতে কত কি ঘটে, ফলে বড়রা সময়ে সময়ে হঠাৎ চটে ওঠেন। ছোটরা তা বুঝতে পারে না। তারা অবাক হয়ে ভাবে ভালমানুষ লোক ক্ষেপে গেলেন কেন? অস্বস্তি-ভয় বোধ করে তারা। Security জ্ঞান চলে যায়। মনে হয়, পায়ের নীচের এই মেঝেও বোধহয় স্থির নয়, সরে যেতে পারে, অমুকদি যেমন হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধরলেন। আবার ছোটদের অসুখ করতে পারে, মন খারাপ থাকতে পারে। না বুঝে কোন ত্রুটী দেখলে বকা বা শাসন করা উচিত কি? অনেক সময়ে অনেক শিশুর বাড়ীতে নানা অশান্তি ঘটে। ফলে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়।

শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ও ডে-স্কলার মেয়ের বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না। এটা ভুল। আমাদের আদর্শ শিক্ষয়িত্রী যোগ রেখে চলবেন, বিশেষ করে যে ছাত্রী পিছিয়ে-থাকে (backward) তার সম্পর্কে। মনস্তাত্ত্বিক প্রণালী দিয়ে গলদের বিচার করে সংশোধন চলবে তাহ'লে।

ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীকে অতিরিক্ত ভয় পেলে চলবে না। দেখি, ছোটদের অভিমানের বিশেষ মূল্য নেই বিদ্যালয়ে। অথচ, অভিমান একটা বিশেষত্ব শিশু-স্বভাবে। অভিমানে অনেক সময়ে তারা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।

পক্ষপাতিত্ব বা ফেভারিটিস্‌জম্‌ একটি দোষ। যে ছাত্রীকে শিক্ষয়িত্রী পক্ষপাত করেন সে জয়গৌরব বোধ করে, জীবনে কোথাও ঠেকে না সে। আদর-স্নেহ জীবনে পাথেয় হয়ে থাকে তার। কিন্তু, অন্য মেয়েরা? তারা যে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে! প্রিয় ছাত্রীদের দিয়ে কাজকর্ম্ম করান হয় ক্রমাগত; যেমন, 'যাও, বইটা আন লাইব্রেরী থেকে,' 'যাও, অমুকদিকে এটা বলে এস।' হয়ত সে মেয়েটি সত্যই অন্যদের চেয়ে ভাল পারে কাজটা। সে আরো চট্‌পটে হয়ে ওঠে। কাজ করা বাড়ীতে খারাপ লাগলেও, স্কুলের কাজে যে মস্ত কৃতিত্ব। কিন্তু অন্য অসংখ্য মেয়েরা. যারা পেছনে বসে ম্লানমুখে চেয়ে চেয়ে সহপাঠিনীর গৌরব দেখে, তাদের মনে কেমন লাগে? একজনকে নিয়ে ত আজ আমাদের চলবে না—আজ আমরা সমগ্রভাবে এগিয়ে চলতে চাই! তাই কাজের ভার দিয়ে, মনোযোগ দেখিয়ে সবাইকে তৈরি করে নিতে হ'বে। গড়ে তোলার সময় স্কুল-জীবনে।

আরও একটু বলব। শিক্ষয়িত্রীরা স্কুলের নানা উৎসবে মেয়ে বাছবার সময়ে ভেবে দেখেন যেন কথাটা। গান-নাচ-অভিনয়ে সব মেয়ের প্রতিভা থাকেনা, কিন্তু অনেকের ইচ্ছা থাকে সকলের সঙ্গে উৎসবে যোগ দেয়, লোকের চোখে পড়ে। বিশেষতঃ, এইসব ব্যাপারে বেছে বেছে যাদের নেওয়া হ'ত, তারা একটু গর্ব্ববোধ করত। অন্যেরাও ঈর্ষ্যা কৌতুক নিয়ে দেখত। চিত্রতারকাদের কাজের প্রতি যেমন মনোভাব, তেমনি। হয়ত

তারা কিছু পারেনা, উপযোগীও নয় তারা। তবু, ছোটখাটো ভূমিকায় তাদেরকে একটু সুযোগ দেওয়াতে দোষ কি? কত লোকের মধ্যে কত প্রতিভা গোপন থাকে, কে জানে?

"পথেতে দেখিলে ছাই
উড়াইয়া দেখো তাই,
মিলিলে মিলিতে পারে মাণিক-রতন।"

শিক্ষার প্রতিটি কেন্দ্র এক একটি যুদ্ধ-শিবির। এখানে সৈন্য তৈরি হ'বে—রোগ, অশিক্ষা, নীচতা, মিথ্যার বিপক্ষে যুদ্ধ করতে। তাই সৈন্য, তোমরাও অবহিত হও। সেনাপতির হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। তাঁদের শিক্ষা মেনে সহযোগিতা করে যাও খুসীমনে। প্রতিটি লোক আজ প্রয়োজনীয়। আমরা প্রত্যেকে যে স্বাধীন দেশের সম্পদ।

চোদ্দো

আজও মঞ্জু ছাদে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জীবন অতটা মধুর, ভাবনাহীন নেই। হাল্কা মেঘের মত কতগুলো দায়িত্ব তার আকাশকে ঢেকে ফেলেছে। প্রথম শ্রেণীর বছরটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। টেষ্ট-পরীক্ষার অল্প ক'দিন বাকী। ক'দিনের মধ্যেই নয় দশ বৎসরের লম্বা স্কুলজীবন চিরদিনের মত শেষ হয়ে

যাবে। যত দিন এগিয়ে আসছে, তত কলেজে ঢোকার আগ্রহ নিভে যাচ্ছে। যেন আসন্ন বিজয়ার সুর লেগেছে ফুরিয়ে-যাওয়া দিনগুলোতে। স্কুলবাড়ীর প্রতিটি ইঁট প্রিয় হয়ে উঠেছে প্রাণের চেয়ে। প্রতিজন শিক্ষয়িত্রী হয়েছেন আত্মীয়ের বাড়া আত্মায়।

পড়াশোনা বিশেষ হচ্ছে না মঞ্জুর। ক্লাশের মেয়েরা প্রাণপণে পড়ছে গৃহশিক্ষক ও অভিভাবকের কাছে। মঞ্জুর জন্য কোনদিন গৃহশিক্ষক রাখা হয়নি, এখনও রাখা হোল না। পড়া দেখাবার লোকও বাড়ীতে নেই। নিজের মনে সে বইগুলো আগাগোড়া পড়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রথায় পরীক্ষা নেয়, তা সে জানে না। উত্তর তৈরি করে প্রশ্ন লেখার কায়দা কোনদিন শেখেনি। ফলে, জ্ঞানটুকু হয়েছিল খাঁটী। পড়ার বই ক্রমাগত পড়ে যেতে পারেনি মঞ্জু কোনদিন, নাম-জাদা পড়ুয়া মেয়েদের মত। শিক্ষয়িত্রীরা বলতেন, “ওর ইনটেলিজেন্স্ আছে, অ্যাপ্লিকেশ্ন্ নেই।” তবু মঞ্জুর ওপরে বিরাট আশা রেখেছিলেন তাঁরা। সে আশা পূর্ণ হয়নি। মঞ্জু দুঃখিত। ক্লাশপরীক্ষায় একবারও দ্বিতীয় হয়নি সে বটে, কিন্তু ক্লাশে ভাল মেয়ে কয়েকটি এসেছিল বছর চার আগে। তাদের পড়াশোনা ছিল নিয়ম বাঁধা, পড়ত তারা দিনরাত। হয়ত মঞ্জু প্রবেশিকাতে তাদের সঙ্গে না-ও পারতে পারে। যে রকম মাষ্টার রেখে, রুটীন বেঁধে পড়ার বহর তাদের! কে জানে? ক্ষতি নেই। মঞ্জুর জগৎ বহুদূরে বেড়ে গেছে।

মিস্ বাসু যে বীজ রোপন করেছিলেন বাইরের বই পড়িয়ে, সেই বীজ ফসল দিল আরো মিস ব্রাউন বলে একজন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর প্রশ্রয়ে। বাড়ীতে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চার আব-হাওয়া বইত পূরোদমে। স্কুলে ইংরেজি সাহিত্যের রেশ লাগল কিশোর মনে। এতদিন মঞ্জু পড়তো **'Little Women', 'Bad Boy's Diary', 'William', 'Pollyanna'** প্রভৃতি। এখন এল ইংরাজি সাহিত্যের মণিমুক্তা :—ডিকেন্স্, থ্যাকারে, জর্জ্জ ইলিয়ট, ব্রণ্টে, গোল্ডস্মিথ, অষ্টিন, হেনরী উড্ প্রভৃতি। অন্য দেশীয় সাহিত্যও পড়ল সে, যতটা ইংরেজির মারফৎ পড়া যায়। ইবসেন, গর্কি, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, হল্‌কেন্ ইত্যাদি। এক একজন লেখকের বই প্রায় সবগুলো পড়ে ফেলত। দিনরাত পড়ত, বাংলা বইও পড়ত যত পারে। পড়তে পড়তে রোগা হয়ে গেল। স্বাস্থ্য নষ্ট হতে বসল। চোখ জ্বালা করত, মাথা ধরত। তবু থামতে পারত না। বইয়ের স্তূপের দিকে কে যেন ঠেলে নিয়ে যেত! পড়ার বই কি আর ভাল লাগে মঞ্জুর? নীরস বইগুলো। একবার ত ক্লাশেই পড়ান হয়েছে। পরীক্ষার জন্যে আবার ওই ছোট ছোট বাজে বইগুলো পড়তে হবে কেন, যখন সমস্ত জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার চোখের সামনে খোলা? মিস ব্রাউন লাইব্রেরী দেখাশোনা করতেন। যত চায় বই দিতেন মঞ্জুকে।

রাস্তার ওপার থেকে টুনুর উদাস-করা গলার গান ভেসে

এল,—"দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে"—। 'দূরদেশী' কথাটায় যেন প্রাণ ঢেলে দিয়েছে টুনু। মন উদাস হয়ে উঠল মঞ্জুর। দূরদেশী রাখাল কে? সে রাখাল কি জানে সুখের খোঁজ? মঞ্জু ছোট ছিল এতদিন, এখন বড়ত্বের গণ্ডিতে পা দিতে চলেছে। পরিবর্ত্তনের মুখে খাপছাড়া লাগে নিজেকে। টুনু ত নির্ব্বিবাদে বড়ত্বে কায়েমী সত্ত্ব নিয়েছে। এখন টুনু রীতিমত একজন মহিলা বা লেডি।

টুনুদের বাড়ীর ঘরে ঘরে উজ্জ্বল আলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। লোকজন চলাফেরা করছে। চাকর চায়ের খুঞ্চে হাতে ঘোরাঘুরি করে চা বিলোচ্ছে। সাজপোষাকে ঝল্‌মলে টুনু গান গাইছে অর্গানের সামনে। বাড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে নীচে। এখনি বেড়াতে যাবে ওরা। হয়তো সিনেমাতে যেয়ে দামী আসনে বসবে।

টুনুদের পাশের মাঠকোঠাতে চোখ পড়ল হঠাৎ। বাড়ীর বউটি ছেঁড়া চট দিয়ে জানলা ঢেকে শিলনোড়ায় মশলা পিষছে। তোলা উনুনের ধোঁয়াতে চোখে জল ওর। ও কি কখনও গাড়ীতে চড়ে সিনেমাতে যাবার কথা ভাবতে পারে? আচ্ছা, যদি টুনু একদিন গরীব বউটিকে নেমন্তন্ন করে গাড়ী চড়িয়ে সিনেমা দেখায়, তাহ'লে বউটি কত খুসী হ'বে, না? সারা জীবন মনে করে রাখবে। টুনু অবশ্য কখনও তা করবে না, জানে মঞ্জু। টুনু গরীবকে ঘৃণা করে। টুনুদের বাড়ীর চারপাশে গরীব দুঃখীর ভিড়। বস্তি আছে। নোংরা

অশিক্ষিত লোকের বস্তি। ভেঙ্গে ভেঙ্গে বড়লোকের ইমারৎ তৈরী হচ্ছে। একটু একটু করে যাচ্ছে বস্তি, এক একখানা লোহা ইঁটের বাড়ী উঠছে। টুনুদের বাড়ীও ত এমনি বস্তি-ভাঙ্গা জমিতে তৈরী হয়েছে। আবছাভাবে মনে পড়ে মঞ্জুর টুনুদের বাড়ীর পিছনে ঝোপঝাপ, পেয়ারা গাছে দুলছে দোলনা। কে যেন দোলাচ্ছে মঞ্জুকে। আশেপাশে পুরণো ভাঙাচোরা বাড়ী ছিল। বাসিন্দারা গরীব লোক। কোথায় গেল তারা? লাটুবাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন, বাচ্চা মঞ্জুকে কোলেপিঠে নিয়ে আদর করতেন। সে সব জায়গায় ঝকঝকে বাড়ী হয়েছে। তাছাড়া, বস্তিও বিস্তর ছিল। সব যাবার মধ্যে। দু'একখানা এখনও আছে। এক খোট্টা ডালপুরীর দোকান আছে। তার ঝগড়াটে মেয়ে প্রায়ই মঞ্জুর কাছ থেকে পুতুল-খেলনা নিয়ে যায়। আচ্ছা. টুনু এইসব বস্তির ছেলেমেয়েদের কখনও কিছু দেয় না কেন? দূর থেকে ওরা লোভীর মত টুনুর ঐশ্বর্য্যের দিকে চেয়ে থাকে। বড় বড় বাড়ীর আনাচে-কানাচে টিনের-খড়ের ঘর দু'চারখানা। মিটমিটে রেড়ির প্রদীপ জ্বলে। এদের মাঝখানে আলো-গানে ভরা টুনুর বাড়ী। কি বেমানান। যেন একটুকরো দ্বীপ, দুর সমুদ্র থেকে ভেসে এসেছে। চারিপাশের সঙ্গে কোন যোগ নেই। কিন্তু যোগসূত্র ত গাঁথা যায় টুনু ত ইচ্ছা করলেই পারে। ইমারতে নিমন্ত্রণ দিতে পারে বস্তিকে।

মঞ্জুর বাড়ী? নিরানন্দ না হ'লেও উৎসবের ছোঁয়া নেই।

একজন উঠতি বয়সের মেয়ে চারপাশে আনন্দ চায়, স্ফূর্ত্তি চায়। সে কথা বোঝে কে ? বাড়ীতে সঙ্গী পর্য্যন্ত নেই তার। বাড়ীর খেলার আসর ভেঙ্গে যাবার মত। বিমল বড় হ'য়ে নানা দিকে ব্যস্ত, কমই আসে ও। বুদ্ধু ও বাইরের জগতে চলে গেছে। বন্যার সাহায্যে সেদিন মঞ্জুদের বাড়ীর সামনে দিয়ে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে চলে গেল বুদ্ধু। সকলেই লেখাপড়ার চাপে ব্যস্ত। মেয়েরা বড় হয়ে মেয়েলী হয়েছে। মঞ্জুর তাদেরকে ভাল লাগে না আর। ছেলেরা বড় হয়ে মঞ্জুকে দলে নিতে চায় না। বাদুড়ের মত মঞ্জু বেচারী পশু বা পাখী কোন দলে ঢুকতে পারে না। একা পড়েছে সে। বিদেশী সাহিত্যের 'পীটার্ প্যানের' মত সে—বাড় নেই তার।

এই খাপছাড়া দিনগুলোতে মঞ্জুর বড়কাকা কিছু আনন্দ আনতেন। দেশে থাকতেন উনি, আসতেন প্রায় কলকাতায়। তখন সিনেমা-থিয়েটার-সার্কাস-প্রদর্শনী দেখে দেখে বেড়াতেন। বেড়াতে যাবার সময়ে নিয়ে যেতেন মঞ্জুকে। বই-খেলনা, যা ভাল দেখতেন, কিনে দিয়ে যেতেন। কিন্তু, এখানে থাকতেন না ত তিনি বারমাস। বাবা কাজে ব্যস্ত, দু'ভাই অনেক বড় মঞ্জুর চেয়ে। তারা ওকে আমল দেয় না। ছোটকাকা বিদেশে চলে গেছেন, বড় কাকা দেশে থাকেন। বাড়ীতে ত আর কেউ নেই। এ সব ক্ষেত্রে মায়ের উচিত মেয়েকে সঙ্গ দেওয়া, যাতে সে একা বোধ না করে। কিন্তু,

মঞ্জুর মা সে ধরণের লোকই নয়। মেয়ে ঠিকমত খাচ্ছে, পড়ছে। অসুখ হ'লে সেবা-যত্ন করা হচ্ছে। এই ত যথেষ্ট। আর কি চাই?

মানুষের অভাব কি শুধু টাকাকড়ির, খাওয়া পরার? টুনুদের বাড়ীর চারপাশে এত গরীব, একবেলা খেয়ে থাকে। টুনু খাচ্ছে চারবেলা। উচিত সকলের সমান হওয়া। মঞ্জুরও উচিত তার বাড়তি খাবার ভাগ করে দেওয়া ক্ষুধার্ত্ত ছেলেমেয়েকে। সে পারে কই? মঞ্জু ওদের বুঝতে পারলেও, মিশতে পারে না। দূর থেকেই ভালবাসতে পারে। কাছে যেয়ে ভালবাসতে পারে আরতি।

কিন্তু, অভাব ত অনেক? আনন্দ চাই, হাসি চাই। শুধু ভাত-কাপড় নয়। নিরানন্দ খেলার ঘরে, মুড়িওলীর দাওয়াতে, তেলেভাজার দোকানে, দিনমজুরের বস্তিতে শুধু খেতে দিলে হবে না। চাই হাসাতে তাদের, চোখে আলো আনা চাই। কে করবে সে কাজ? মঞ্জু? না মঞ্জুর জীবনে সুখের আলোটি কই? যে আলো থেকে সবাকার সুখের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলবে সে? সে ত কিছু পাচ্ছে না। টুনুর আনন্দে নিজের নিরানন্দ দেখে দুঃখ পায় সে। কেন সে অন্ধকার ছাদে একা ঘুরে বেড়াবে, যখন রাস্তার ওপারে টুনু আলোর উৎসবে, আনন্দের গানে গা ভাসিয়ে চলবে? ভাগ্যের ওপর রাগে হাত মুঠো করল মঞ্জু। নাঃ, সে এ সহ্য করবে না!

তখনি রাগের গরমের ওপর ঠাণ্ডা চন্দনের হাওয়া বয়ে গেল যেন কয়েকটি ছত্র মনে পড়ে ঃ—

"My mind to me a kingdom is,"—
"—Around me I behold—
Where'er these casual eyes are cast—
The mighty minds of old."

না, সে একা নয়। অত বই লেখা হয়েছে, ছাপা হয়েছে। তার মত নিঃসঙ্গ লোকের জন্য। লেখকেরা সঙ্গী তার। সে ত একা নয়। একা হ'তে পারে না।

জীবনে আর একটি নূতন আলো লাগছে। বাড়ীতে স্বদেশীর সুর ছিল। বাবা এনেছিলেন, ধরেও রেখেছিলেন। আজকাল মঞ্জুর মনে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠেছে। আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যে কয়েকটি ছেলেমেয়ে মিলে দেশোদ্ধারের ব্রত নিয়েছে তারা। পথটা শুধু জানা নেই। অগ্নিযুগের গান এসেছে মঞ্জুর কলমে। মামাদের 'গুপ্ত সমিতিতে' পড়া হয়। নিজে যেতে পারে না মঞ্জু। সে বাড়ীর বাইরে বা বন্ধুর বাড়ী মা-বাবার সঙ্গে ছাড়া যায় না কোথাও। স্কুলের পত্রিকায় তার কবিতা ছাপা হ'ত না। একটা একবার দিয়েছিল মঞ্জু। রাজদ্রোহমূলক বলে মুদ্রাকর ফেরৎ দিয়েছে—এ ছাপাতে সে পারবে না, এ যে সাক্ষাৎ বোমা। লাভের মধ্যে শিক্ষয়িত্রীর কাছে লম্বা উপদেশ লাভ হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে বাজেয়াপ্ত বই পড়েচে ঢের মঞ্জু—'পথের দাবী', 'কানাইলাল,'

'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা,' ইত্যাদি। মনে মনে বুঝেছে সে পরাধীনতা জ্বালাভরা, মুক্তির সাধনা মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। 'England's work in India'-র প্রতিটি লাইন ঘৃণার সঙ্গে পড়েছে। কি করে ইংরেজ ভারতকে পায়ের নীচে রাখতে চাইতে পারে যখন ছাপার অক্ষরে স্বাধীনতা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করে তারা? নানা ছন্দে লিখে তারাই ত প্রচার করে :—

"Breathes there the man, with soul so dead,
Who never said, "This is my native land"—

যারা শিক্ষিত, তারা কি করে পরের কাছে দাসত্ব সইবে? মঞ্জু পারেনা সহ্য করতে। পুলিশের অত্যাচার, দেশপ্রেমিকের লাঞ্ছনা মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। একটা কিছু সে করবেই, মরতে হয় মরবে। কিন্তু, কি করতে পারে মঞ্জু? বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ নেই তার। তার ছোট্ট জগতের লোকেরা এ বিষয়ে কখন ভাবে না। সহপাঠিনীরা মেমী অনুকরণে জীবন ধন্য মনে করে। যার বাবা যত সরকারী গোলাম, তার তত প্রাধান্য। স্কুলে স্বাধীনতা-আন্দোলন সযত্নে এড়িয়ে চলেন কর্ত্তৃপক্ষ। এইত মঞ্জুকে তকলী কাটতে দেখে মিস্ ব্রাউন তাকে লাইব্রেরীতে ডেকে নিয়ে ঝাড়া একঘণ্টা বুঝোলেন—"তুমি কি সাধারণ মেয়েদের মত লেখাপড়ার সময়ে জ্ঞান সঞ্চয় না করে স্রোতে ভেসে যাবে? স্বাধীনতা চাও ত তার সময় ত পরেই আছে। আগে উপযুক্ত হও। বল, কথা

দাও আমাকে, এ সব ছেড়ে তুমি পড়াশোনা করবে আগে ?”

বোঝাতে বেগ পেতে হ’ল না মিস্ ব্রাউনের। তিনি ইংরেজ মহিলা—চিরকাল ভুল বুঝিয়েই তাঁরা দেশটি শাসন করে এসেছেন। কিন্তু, মিস্ ব্রাউনকে ত ভাল লাগে মঞ্জুর। ভাল লাগে! তিনি ত শত্রুর দেশের লোক, তবু তাঁকে ভালবাসি কেন? মিস্ ব্রাউনকে যে দিন থেকে ভালবাসল মঞ্জু, সে মুহূর্ত্ত মনে আছে। একদিন বিকেলের দিকে ক্লাশে টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে টেনিসনের “Crossing of the Bar” পড়ে শোনাচ্ছেন মিস্ ব্রাউন। সূর্য্যের পড়ন্ত আলো কাঁচাপাকা চুলে এসে পড়েছে, মুখে প্রশান্ত ভাব।

“—Sunset and Evening star,
And one clear call for me!
And may there be no moaning of the bar,
When I am put out to sea.”

জীবন-সমুদ্রে খেয়া ত শেষ হয়ে এল মিস ব্রাউনের। তাই তাঁর মুখে এ কবিতা শোনাতে মন কেঁদে উঠেছিল মঞ্জুর। না, পারবেনা সে। মিস ব্রাউনের দেশের লোকের সঙ্গে শত্রুতা করবেনা সে। সবাইকে ভালবেসে যাবে সে। সাহিত্য-জগতই ভাল। লেখাপড়া নিয়ে থাকবে মঞ্জু। মারামারি, কাটাকাটি সইবে না তার।

মলিনার একটি গান কেন জানিনা মনে পড়ে গেল। মলিনার মুখে ইটালিয়ান চিত্রী রাফাইলের আঁকা ছবির

মত অপার্থিব ভাব। ও ছবি আঁকে, গানের গলা মিষ্টি। একটা গান বারে বারে ওর মুখে শুনত মঞ্জু। নির্জন ছাদে ফিরে এল গানটা। মলিনার গলা যেন কানের কাছে গেয়ে উঠল :—

"জীবন-মরণে সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধুহে, তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে"—

ভগবান সবাইকে ভালবাসেন, সকলের বন্ধু তিনি। একা একা যত ছেলেমেয়ে, তারা ত একা নয়। তিনি আছেন। তাঁর ডাক নীল আকাশের মেঘ ভেদ করে সাড়া জানাচ্ছে : "ওগো, তোমরা এস। একা একা মন খারাপ করে থেক না। সকলের বন্ধু আছি আমি। আমি কখনও তোমাদের ভুলে থাকিনা, জেনো।" ঈশ্বর ত ডাকছেন, সাড়া পাচ্ছি। কিন্তু, লাফিয়ে আকাশে উঠব কি ? তাঁর কাছে যাব কেমন করে ? উন্নত হ'তে হ'বে। ভাল কাজ, ভাল চিন্তা ধীরে ধীরে ধূলোকাদা থেকে ওপরের দিকে ঠেলে তুলবে। নানা কবিতা ভেসে আসতে লাগল মঞ্জুর মনে। নিজের ভাবে বিভোর হ'য়ে ছাদে ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি করে যেতে লাগল ও।

এইত, তার মনে হঠাৎ আশ্চর্য্য ভাব ভেসে এল! সাধারণ বাড়ী, ছোট রাস্তা, সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে টেনে। দূরের সুর বেজে উঠছে মনের কোণে কোণে। নীল আকাশ থেকে যেন ফুল ঝরার মত কবিতার ফুল পৃথিবীর

বুকে ঝরছে। কোথায় কত দূরে ঈশ্বর? তাকে যেন হাতের পাশে পাওয়া যাচ্ছে এখন।

কয়েকদিন পরে টেষ্ট পরীক্ষা। পড়া তৈরি হয়নি মঞ্জুর। বাড়ীতেও নানা অশান্তি এসেছে। বিষণ্ণ দিন টুনুর উজ্জ্বল দিনের দিকে চেয়ে কাঁদে। স্কুল শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবু, সমস্ত দুঃখ মিলিয়ে গেল কোথায়? অকারণে একটা অদ্ভুত আনন্দে সারা মন ভরে উঠল মঞ্জুর। বর্ত্তমানে আনন্দ না থাকলেও কত কি পাবার আছে তার? ভবিষ্যতের সেই সোনালী স্বপ্ন যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুঃখ কষ্ট থাকে না। জীবনের পথ এই ছোট জগতের মধ্যে ত শেষ হয়নি—অনেক, অনেক দূর চলে গেছে—সোনার স্বপ্ন-ঘেরা আনন্দ-মহলে।

এইতো নাইটের কাজ, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা, স্বপ্ন সৃষ্টি করা। সুখ দিতে না পার, মঞ্জু, তুমি স্বপ্ন দাও। সুন্দরের স্বপ্ন। কুশ্রী পৃথিবী, বিশ্রী মানুষ, সব সুন্দর করে যাব। এই চেষ্টার মধ্যেই আমি অমর হব। পৃথিবীতে এই আমার নিজস্ব দান আমাকে অমর করবে।

কোন মেয়ের এখনি বিয়ের কথা চলছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার শেষে হয়ত বিয়েই হয়ে যাবে। অবাক হয়ে দেখে মঞ্জু, তাতে সে মেয়েদের কোন মনোকষ্ট নেই। গয়না-কাপড়, সুন্দর বর পাবার লোভে কেউ কেউ বা খুশী। কি বোকা ওরা? পড়া শেষ হ'ল না—একটা প্রকাণ্ড জীবন জলাঞ্জলি

দিয়ে ঘরের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বাঁধা দিতে চলেছে! সমস্ত জগতের মানুষ থেকে আলাদা হ'য়ে যাবে তারা ছোট সীমার মধ্যে ঘর-কন্না নিয়ে। বিয়ে করুক না, কে নিষেধ করছে? এখনি, এত আগে কেন? আর, যে সংসারে তাদের যোগ্য জায়গা হ'বে, যে স্বামীর সঙ্গে আদর্শের মিল হ'বে,—সেই তাদের যথার্থ বিবাহ। যতদিন মেয়েরা বিয়ের লোভ না ছাড়তে পারবে, 'হলেই একটা হ'ল' মত ত্যাগ না করতে পারবে, ততদিন মেয়েদের দ্বারা জগতের কোন বৃহৎ কাজের আশা নেই।

আবছা বুঝল মঞ্জু—আদর্শ না থাকলে জীবন মিথ্যা। সকলের উন্নতির উদ্দেশে গঠনমূলক কাজের মধ্যেই প্রতি জীবনের সার্থকতা।

মঞ্জু ঠিক থাকবে। আরতি কথা দিয়েছে, নদীর ধারে কাঠের ঘরে ষ্টুডিও। সেখান থেকে তারা শিল্প-সাহিত্য জগতকে উপহার দেবে। শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ করবে তারা। একা একা বড় গুরুভার কাজ। ভয় কি? আরতি ত আছে। মঞ্জু গুণ্ গুণ্ করে বলতে লাগল :—

"একাকী গায়কের নহে ত গান, গাহিতে হ'বে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আর একজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে ত' কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্ম্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি, যুগল মিলিয়াছে আগে"—

পোস্টস্ক্রিপ্ট

অনেকদিন পরের কথা। এক যুগ কেটে গিয়েছে। এতক্ষণ তোমাদের কি, শোনালাম? চারটি মেয়েব কথা? না, না, অনেক মেয়েব কথা। একটি স্কুলকে কেন্দ্র কবে হাসিকান্নার দিন তাদের ফুলের মত ফুটে উঠেছিল। সেই স্কুলেব গল্প? না, না। কিশোর-জীবনে যত আশা, উৎসাহ, তাবই গল্প।

যে মেয়েদের গল্প শোনালাম, তারা কেউ আদর্শ নয়। কিন্তু এক সঙ্গে এক আদর্শ ধরে মালার মত তাদের হাসিকান্নার দিনগুলো একটি সুতোয় গাঁথা ছিল তখন। সে আদর্শ বড হ'বার, ভাল হ'বার, জীবনে সার্থক হ'বার। তাবা কেউ অসামান্য ছিলনা। যাবা আমার এই গল্প পড়ছ, তারা ওদের থেকে অনেক অসামান্য জানি। কিন্তু, আজ মনে হয়, জীবনে অত স্বপ্ন কারুর ছিলনা, পরস্পরকে অত ভাল কেউ বাসেনি।

মনিমালা ছিঁডে গেছে। যে সমস্ত মণি নিজেব আভায় চারিদিক উজ্জ্বল করে তুলতে পারত, তারা ধূলায় মিশেছে। শিল্পীর প্রতিভা যার ছিল, আজ সে বড়লোকের গৃহিনীত্বের গর্ব্বে হৃষ্টপুষ্ট শবীর নিয়ে গাড়ী চড়ে পান চিবোতে চিবোতে নেমন্তন্ন বাড়ী নামছে। অসাধারণ কর্ম্মী যে ছিল, আজ হাতাবেড়ির মমতাতে তার কর্ম্মজীবন শেষ হয়েছে। যে নেত্রী

হ'তে পারত, সে আজ শাসনে-বারণে বিব্রত। স্কুল-মাষ্টারী, অফিসে কেরাণীগিরি, বা বিয়ের প্রতীক্ষায় বাড়ীতে হাঁ-করে-বসে-থাকা বাকী বন্ধুদের জীবন—এই ভাবে শেষ হচ্ছে। কদাচিৎ কেউ সফল করে তুলেছে জীবন কর্ম্মের, প্রীতির পথে। তারা ধন্য। কিন্তু বাকীরা ? মণিমালার মণিমাণিক, তোমরা এইভাবে হারিয়ে যাও কেন ? তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবার কি কোন উপায় নেই ?

সুখে আছ অনেকে, দুঃখে আছ অনেকে। ভাল থাক, সুখে থাক। তবু, কখন কি সেই দিনগুলোর কথা মনে হয়না, যখন জগতকে ভাল করবার শপথ তোমরা গ্রহণ করেছিলে, যখন তোমরা রাজা আর্থারের নাইট হ'বার ব্রত নিয়েছিলে ? তোমাদের চারপাশে কত দুঃখ-কষ্ট, কত অন্যায়, কত মিথ্যা ! কিছুই কি করতে পারনা তোমরা ! অবকাশ সময়ে কি একটু গঠনমূলক কাজ, যত সামান্যই হোক, করে করে তোমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারোনা ? পাড়ার শিশুদের একটু শিক্ষা দিতে পার, যে না খেয়ে থাকে, তাকে দুমুঠো ভাত দিতে পার, নারীর দুর্দ্দশা দূর করবার চেষ্টা করতে পার। আর পার, নিজের ভাইবোনদের ছোট ছেলে-মেয়েদের আবার নাইটের পণ নেওয়াতে। নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে আলাদা হ'য়ে থেকোনা তোমরা। নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীর জন্যে যা করবে তাতেই হাসিকান্নার দিনের স্মৃতি ধন্য হয়ে উঠবে !

কত গান গাওয়া হ'লনা, কত কবিতা লেখা হ'লনা, কত স্বপ্ন ভেঙে গেল! তবু কিছু হারায়নি। কালের খাতায় সব জমা আছে, আর জমা আছে একজনের মনে। সে আপন মনের গহন দ্বারে কান পেতে জেগে বসে আছে।

নন্দিনী, তুমি কোথায় জানি না। তবে তুমি বৈজ্ঞানিক হওনি, জানি। সংসার গ্রাস করেছিল তোমাকে। তুমি আর সুপ্রেক্ষিতা কালসমুদ্রে হারিয়ে গেছ—তোমাদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানাই। চন্দ্রার বিয়ে হয়েছে। মায়ের আদেশ মেনে বিবাহের প্রতীক্ষায় সফল শিল্পজীবনের আশা মুছে ফেলেছিল সে। যে অ্যানা প্যাভলোভা হতে পারত, নৃত্যের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নৃত্যকলাকে জীবন দিতে পারত, সে আজ একজন সাধারণ অফিসার-গৃহিণী হ'য়ে পার্টি ও সমাজ নিয়ে আছে। অবশ্য যদি তাতে সে সুখী হয়, সেই ভাল। বুলু শিক্ষা দান করছে—লীলা, বনি, মন্দা, সতী করছে সংসার। মণিকার জীবনে এসেছে সমস্যা। চিত্রা বিবাহিতা—তবে শিক্ষা দেওয়া ছাড়েনি। মিনতি, গৌরী, মলিনা, চারু, অনিমা, জ্যোৎস্না, রেণুকা, বীণা,—সকলে এক অলস আরামে ডুবে আছ জানি, তবু একবার মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় পুরণো দিন। পুরণো স্মৃতি ডেকে আনতে ইচ্ছা করে।

আবার অনেকে আলেয়ার মতো বেড়াচ্ছ। পথ খুঁজে পাওনা কেন? সে দিন ত পথের সন্ধান জানা ছিল। তোমরা ত আলেয়া নও, তোমরা দীপশিখা। অন্যকে তো তোমরাই পথ দেখাবে।

নিনি, তোমার স্বপ্নের খোঁজ আর পাই না। নীলিমা, তোমার জীবনে উদ্দেশ কই ? রেণু ঘোষ, মঞ্জুর অটোগ্রাফ খাতায় কাঁচা হাতের লেখা তোমার প্রথম কবিতা উপহার দিয়েছিলে। তুমি হয়ত ভুলে গেছ, তোমার কবিতা তোমাকে শোনাই :

দুখ শেষে সুখ আসে,
সুখ শেষে দুখ।
জানিও নিশ্চিত ইহা,
না হ'বে বিরূপ।

যারা দুঃখ পাচ্ছে সকলের সম্বন্ধে এই কথা খাটে। এতে সকলের সান্ত্বনা আছে।

কিন্তু, টুনু কোথায় ? যার গলায় একদিন পাপিয়া বাসা বেঁধেছিল, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী যার খেলার সাথী হয়েছিল, তারও আলো নিভে গেছে। ভুলপথে চলবার শাস্তি টুনু পেয়েছে। তার কথা বলবার নয়।

সকলের শেষে, সকলের প্রথমে যে ছিল, আরতি। আরতি আরতি! তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি ভুলে গেছ, তোমার কথা তুমি রাখনি। ষ্টুডিওর কথা মঞ্জু সত্যি ব'লে ভেবে নিয়েছিল। নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুযোগের আশায় ছিল সে। তুমি ত এলে না।

আরতি, আজ তোমার জীবন সাধারণ—সামান্য মেয়ের জীবন। ঘরকন্না-হাতাবেড়ির গৃহগত জীবন। তাতে তুমি সুখী থাকলে বলার কিছু নেই। কিন্তু তুমি কি না হ'তে পারতে!

কখনও কি ঘুম-হারা রাত্রে, কাজ-হারা দিনে পুরণো দিনের ছবি তোমার মনে ভেসে আসেনা? দূরের বাতাসে তোমার কানে বাজে না—সব ভুলে আছ ?

আরতি, তুমি ভুলেছ, কিন্তু মঞ্জু ভোলেনি। আজ সে একা। একা কঠিন পথ চলতে হ'বে তার। সকলের ভোলার প্রায়শ্চিত্ত একা করতে হ'বে তাকেই।

সে যে ভোলেনি, তার প্রমাণ আজও তার জীবনে স্বপ্ন আছে—স্থন্দরের স্বপ্ন। সে কোন অসামান্য কাজ করে দেখাতে পারছে না। কারণ, সে নিজে সামান্য। সকলে এক হয়ে কাজ করলে অসামান্যতা লাভ করা যাবে, এই আশা ছিল মঞ্জুর। সে আশা সফল করতে কেউ এগিয়ে এলে না। হয়ত সফল সে-ও হ'বে না। কিন্তু, চেষ্টার মধ্যেই তার জীবনের সার্থকতা।

তাই কঠিন একলা পথে ক্লান্তি নেই মঞ্জুর। জীবনের ব্রত সে এখনও ভোলেনি। সে ব্রত প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে শক্তি জুগিয়ে চলেছে। মঞ্জু এখনও ভোলেনি।